কোরাণের গল্প
বন্দে আলী মিয়া

কোরআনের গল্প

বন্দে আলী মিয়া

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ | জুন ১৯৭৪
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২

বারতম মুদ্রণ | মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০

প্রচ্ছদ | হাবিবুর রহমান

বর্ণবিন্যাস | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | বেলাল অফসেট প্রেস
৪ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য | **আশি টাকা মাত্র**

QURANER GOLPO *Written by Bandey Ali Miah Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. 12th Edition : March 2014*
Price : Tk. 80.00 Only.

ISBN 984 11 0530 5

সূচিপত্র

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

হাদিসের গল্প

ছোটদের বিষাদ সিন্ধু

ছোটদের নজরুল

গল্পের মজলিশ

আজ বাকি কাল নগদ

ইরান তুরানের গল্প

অতি চালাকীর বিপদ

রাজকন্যা মানিকমালা

দুই বন্ধু

সাঁঝের রূপকথা

যাদুর পাগড়ী

ভাগ্যলিপি

অতি লোভের ফল

পৃথিবী সৃষ্টির একেবারে প্রথম দিকের কথা। তখন এখানে কোনো জীবজন্তু, পশুপক্ষী বা কীটপতঙ্গ কিছুই ছিল না। সমস্ত দুনিয়ায় বাস করতো শুধু জিনেরা। তারা কেবলই নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি মারামারি নিয়েই থাকতো, ভুলেও কখনো আল্লাহ্‌তা'লাকে স্মরণ করতো না। একদিন আজাযিল খোদার দরগায় আরজ (প্রার্থনা) করলো ঃ হে প্রভু, আমাকে হুকুম দাও, আমি দুনিয়ায় গিয়ে জিনবংশ গারত (ধ্বংস) করে দুনিয়া থেকে পাপ দূর করে দেই। খোদা তার আরজ মঞ্জুর করলেন। আজাযিল চল্লিশ হাজার ফেরেশ্‌তাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলো দুনিয়াতে। জিনদের সৎপথে আনবার জন্য অনেক সদুপদেশ দিলো, কিন্তু তারা সে কথাতে একেবারে কর্ণপাতই করলো না। আজাযিল কি আর করে। তখন তাদের ধ্বংস করে বেহেশ্‌তে ফিরে গেলো। জিনের দল নিশ্চিহ্ন হওয়ায় দুনিয়া খালি পড়ে রইলো।

দোজখ (নরক) সব শুদ্ধ সাতটা। তার মধ্যে যে দোজখে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি গোনাগারদের (পাপিদের) রাখা হয়, তার নাম সিজ্জীন। দুনিয়ার নিচের পাতাল এবং পাতালেরও অনেক নিচে সেই সিজ্জীন দোজখ। সেখানে দিনরাত শুধু দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এত আগুন তবু সেখানে ভয়ঙ্কর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে আজাযিলের জন্ম হয়। এই আজাযিল ভাল মানুষের দুশমন। দুনিয়ার মধ্যে তার মতো পাপি এখন আর কেউ নাই। সে শুধু নিজে পাপ করে না; প্রলোভন দ্বারা সকলকে পাপের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু চিরকাল সে এমন ছিল না। তার মতো ধার্মিক এবং সৎ

ফেরেশ্‌তারা অবধি হতে পারে নি। সত্যি সত্যি একদিন সে সকল ফেরেশ্‌তাদের সরদার ছিলো। খোদার নিকট তার মরতবা (মর্যাদা) অন্য সব ফেরেশ্‌তাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো।

আজাযিল জন্মের পরে কিন্তু অন্য জানোয়ারদের মতো বৃথা সময় নষ্ট করেনি। সে খোদার এবাদতে মশগুল হয়ে পুরা একটি হাজার বছর কাটিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত দোজখে তিল পরিমাণ জায়গাও ছিলো না যেখানে দাঁড়িয়ে খোদার উপাসনা করেনি।

খোদা খুশী হয়ে তাকে সিজ্জীন দোজখ থেকে পাতালে আসবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু এখানে এসেও তার অহঙ্কারের লেশমাত্র দেখা দিলো না। বরঞ্চ খোদাতা'লার এবাদতে আরো অধিক মনোযোগ প্রদান করলো। দেখতে দেখতে হাজার বছর কেটে গেলো এবং এমন এতটুকু জায়গা ফাঁক রইলো না, যেখানে দাঁড়িয়ে সে খোদার উপাসনা করলো না। এমনি করে আরো হাজার বছর কেটে গেলো। খোদা তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দুনিয়ার উপরে নিয়ে এলেন। কিন্তু এত উন্নতি করেও সে খোদাকে ক্ষণকালের জন্যও ভুললো না। দিনরাত খোদার এবাদতে মশ্‌গুল হয়ে রইলো। করুণাময় খোদাতা'লা এবার তাকে প্রথম আসমানে তুলে নিলেন।

এমনিভাবে খোদাকে স্তবস্তুতিতে খুশী করে এক ধাপ এক ধাপ করে সে একেবারে আসমানে উঠতে লাগলো। এক এক আসমানে হাজার বছর করে সাত হাজার বছর ধরে আহার নেই, নিদ্রা নেই, দিনরাত কেবল রোজা আর নামাজ, নামাজ আর রোজা করে সে কাটালো। কোনো দিকে তার লক্ষ্য নেই, এক মনে এক প্রাণে খোদার উপাসনায় মশ্‌গুল হয়ে রইলো। খোদা তার ওপরে খুব খুশী হয়ে দোজখের না-পাক (অপবিত্র) জানোয়ারকে বেহেশ্‌তে আসবার অনুমতি দিলেন।

তাহলে তোমরা দেখছো, না-পাক জানোয়ারও নিজের সাধনার বলে কত উন্নতি করতে পারলো। কোথায় ছিলো আর কোথায় এলো। বেহেশ্‌তে এসে তার মনে এতটুকু দেমাগ বা এতটুকু অহঙ্কার দেখা দিল না। ফেরেশ্‌তাগণ যখন হাসিখুশী ও আমোদ-প্রমোদে রত থাকতো, তখন আজাযিল খোদার এবাদতে মগ্ন হয়ে থাকতো। মনে তার সুখ নেই—শান্তি নেই, চোখ দিয়ে কেবল ঝর-ঝর ধারায় পানি পড়তো। সে খোদার

কাছে শুধু এই আরজ করতো ঃ হে এলাহী আল্‌মিন, তোমার এবাদত বন্দেগী কিছুই করতে পারলাম না। আমার গোনাহ্ মাফ করো। আমি বেহেশ্‌ত চাই না—আমি চাই তোমাকে।

এইরূপে বেহেশ্‌তের আমোদ-আহ্লাদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত অগ্রাহ্য করে সে আরো হাজার বছর খোদার এবাদতে কাটিয়ে দিলো। এবার খোদাতা'লা তার ওপর অতিশয় সদয় হয়ে ফেরেশ্‌তাদের সরদার করে বেহেশ্‌তের খাজাঞ্চী করে দিলেন।

হলে কি হবে, তথাপি সে আল্লাহ্‌কে এক মুহূর্তের জন্যও ভুললো না। দিনরাত আল্লাহ্‌র নামে মশগুল হয়ে রইল, আর মাঝে মাঝে বেহেশ্‌তের মিনারের ওপরে উঠে আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনার উপকারিতা সম্বন্ধে ফেরেশ্‌তাদের উপদেশ দিতে লাগলো। ফেরেশ্‌তাগণ তার জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখে নিজেদের মধে বলাবলি করতে লাগলো ঃ আজাযিল খোদার অতিশয় পিয়ারা (প্রিয়)। যদি আমরা খোদার কাছে কখনো কোন প্রকার বেয়াদবি করে ফেলি, তাহলে তার সুপারিশে আমরা বেঁচে যাবো। খোদা তার কথা না শুনে পারবেন না। এমনই করে ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে মরতবা দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু যার এত মরতবা তার আশা এখনো মিটলো না। এখনো খোদার এবাদত ছাড়া আর কোনো দিক লক্ষ্য নেই। নিরালায় বসে কেবল খোদার যিকির করতে লাগলো। এইরূপে আরো হাজার বছর কেটে গেলো। সজল নয়নে কেবলই সে খোদার কাছে আরজ করতে লাগলো ঃ হে রহমান, তুমি আমাকে দোজখ থেকে বেহেশ্‌তে এনেছো। এখন আমাকে মেহেরবানি করে একবার 'লওহে মহফুযে' তুলে নাও।

খোদা তার আরজ মঞ্জুর করলেন। সেখানে গিয়েও খোদার নাম ছাড়া অন্য কিছুই মনের মধ্যে সে স্থান দিলো না—দিনরাত খোদার উপাসনায় একেবারে ডুবে রইলো। একদিন সে দেখতে পেলো 'লওহে-মহফুযের' এক জায়গায় লেখা রয়েছে, "একজন ফেরেশ্‌তা ছয় লক্ষ বৎসর খোদার উপাসনা করিবার পরও যদি সে একটিবার খোদার আদেশ অমান্য করে, তা হলে সে চরম দুর্দশাপ্রাপ্ত হবে। তখন থেকে তার নাম হবে ইবলিশ।" আজাযিল ভয়ে কাঁপতে লাগলো! তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো।

কোন দিকে তার হুঁশ নেই–ধীর স্থিরভাবে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোদার দরগায় আরজ করতে লাগলো।

এমনিভাবে পাঁচ লক্ষ বছর কেটে গেলো। একদিন খোদা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আজাযিল, এখানে কেউ যদি আমার একটি মাত্র আদেশ অমান্য করে, তবে তাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত?

আজাযিল প্রত্যুত্তর করলো ঃ কেউ যদি আপনার আদেশ অমান্য করে, তাহলে তাকে আপনার দরবার থেকে চিরদিনের জন্য দূর করে দেওয়া উচিত।

খোদা বললেন ঃ বেশ কথা। তুমি এখানে ঐ কথাগুলি লিখে রাখ।

আজাযিল খোদার হুকুম পালন করলো!

তোমাদের হয়তো স্মরণ আছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে আজাযিল জিনবংশ গারত করবার পরে দুনিয়া খালি পড়ে থাকে। খোদার বোধ হয় খেয়াল হলো যে, তিনি জিনদের বদলে মানুষ দ্বারা দুনিয়া পূর্ণ করবেন। তিনি সে কথা ফেরেশ্‌তাদের বললেন। তারা জবাব দিলো ঃ হে পরোয়ারদিগার, একবার তুমি জিন পয়দা করে ঠকেছো। তারা কেবল ঝগড়াঝাটি মারামারি করে দিন কাটিয়েছে। আবার এখন মানুষ সৃষ্টি করে ফাসাদ বাড়িয়ে কি লাভ! আমরা তো তোমার এবাদতে মশ্‌গুল আছি।

খোদা হেসে বললেন ঃ দেখ ফেরেশ্‌তাগণ, আমি কি তোমাদের চেয়ে বেশি বুঝিনা।

এই কথা শুনে তারা খুব লজ্জা পেলো। তারা বিনয়ের সঙ্গে বললো ঃ হে রহমানুর রাহিম। তোমার খেয়াল বুঝবার ক্ষমতা কারো নেই।

খোদাতা'লা হযরত আদমকে সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি দুনিয়া থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়ে হযরত আদমের শরীর সৃষ্টি করবার হুকুম দিলেন এবং দেহের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করবার পূর্বে মাটিটুকুকে বেহেশ্‌তের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেবার ব্যবস্থা করলেন?

একদিন আজাযিল ফেরেশ্‌তাদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে হাজির। আদমের চেহারা দেখে সে খুব হাসতে লাগলো। তারপর তাঁকে নিয়ে এমন বিদ্রূপ শুরু

করলো যে, ফেরেশ্‌তারা তাকে বললো ঃ দেখ আজাযিল! খোদা যাকে খলিফারূপে দুনিয়ায় পাঠাবার জন্য পয়দা করেছেন, তাঁকে নিয়ে তোমার এরূপ বেয়াদবি করা উচিত নয়।

ফেরেশ্‌তাদের কথায় আজাযিল কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করলো না, বরং অবজ্ঞাভরে বললো ঃ বলো কি, খোদা এই মাটির ঢেলাকে খলিফারূপে দুনিয়ায় পাঠাবেন! তিনি যদি একে আমার অধীন করে দেন, তাহলে আমি তক্ষুণি একে গলা টিপে মেরে ফেলবো; আর আমাকে যদি এর অধীন করে দেন তবে আমি কিছুতেই একে মানবো না।

আজাযিলের স্পর্ধা দেখে ফেরেশ্‌তারা অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। আজাযিল সেই মাটির মূর্তিটির সুমুখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি চিন্তা করলো, তারপর তার নাক দিয়ে তার শরীরের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে বড় মুস্কিলে পড়লো। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বের হয়ে এসে সেই মূর্তির গায়ে থুথু দিয়ে সেখানে থেকে চলে গেল।

খোদার আদেশে এক শুভ মুহূর্তে হযরত আদমের আত্মা তাঁর শরীরে প্রবেশ করলো। তারপর তাকে বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত করে একটি অনিন্দ-সুন্দর সিংহাসনে বসানো হলো। এইরূপে নিজের খলিফাকে সৃষ্টি করে খোদাতা'লা ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি হযরত আদমকে তোমাদের চেয়ে বড় করে পয়দা করেছি। তোমরা একে সেজদা (প্রণাম) করো।

খোদার আদেশ পেয়ে ফেরেশ্‌তারা অতিশয় ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় আদম আলায়হিস্‌সালামকে সেজদা করলো। কিন্তু আজাযিল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সেজদা তো করলোই না—এমন কি মাথা পর্যন্ত নোয়াল না।

ফেরেশ্‌তারা আজাযিলের এই স্পর্ধা দেখে তাজ্জব হয়ে গেলো।

খোদা আজাযিলকে বললেন ঃ আজাযিল! আমার হুকুমে ফেরেশ্‌তাগণ আদমকে সেজদা করলো, কিন্তু তুমি তাকে সেজদা করলে না কেন?

আজাযিল জবাব দিলো ঃ হে খোদা! আদমকে দুনিয়ার না-পাক মাটি থেকে পয়দা করেছো, কিন্তু তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করছো। আমি তাকে সেজদা করিতে পারি না।

অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়ে খোদা বললেন ঃ রে মূর্খ, আত্ম-অহঙ্কারে তুই আমার হুকুম অমান্য করেছিস! জানিস তাকে মাটি থেকে পয়দা করবার ব্যবস্থা আমিই করেছি–আমিই তাকে ফেরেশ্‌তাদের বড় করেছি,. আর আমিই তাকে সেজদা করতে বলেছি। কিন্তু এত স্পর্ধা তোর কিসে হলো? তুই এতদিন আমার এবাদত করেছিস্ সেই জন্য কি? কিন্তু তুই-ই না লওহে-মহফুযে' লিখে রেখেছিস লক্ষ লক্ষ বৎসর আমার এবাদতে মশগুল হয়ে থাকলেও আমার একটি মাত্র আদেশ অমান্য করলে সমস্ত এবাদত পণ্ড হয়ে যাবে? তুই আজ থেকে মরদুদ হয়ে গেলি। তুই আমার দরবার থেকে দূর হয়ে যা।

খোদা ওই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আজাযিলের চেহারা বিশ্রীরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তার পায়ের রং হলো অত্যন্ত কালো, মুখ হলো শুকরের মুখের মতো। চোখ দু'টি কপাল থেকে বুকের ওপর নেমে এলো। তার নাম হলো ইবলিস্।

আজাযিল নিজের দুর্দশা দেখে মনে মনে খুব ভয় পেলো, কিন্তু বাইরে সে ভাব মোটেই প্রকাশ করলো না। খোদার দরগায় আরজ করলো ঃ হে খোদা! আমি নিজের আহম্মকিতে যে পাপ করেছি তার শাস্তি ভোগ আমাকে করতেই হবে! তার জন্য আমাকে যে দোজখী করেছ, তাও আমাকে মানতে হবে। আমি জানি, হাজার চেষ্টা করলেও আমার এ কসুর মাফ হবে না। তোমার দরবার থেকে চিরকালের জন্য চলে যাবার আগে আমি গোটা কয়েক আরজ পেশ করতে ইচ্ছা করি। আশা করি তুমি তা মঞ্জুর করবে।

খোদা বললেন ঃ বল্ তোর কি আরজ আছে?

ইবলিস্ বললো ঃ আমার প্রথম আরজ এই যে, আমাকে কেয়ামত (শেষদিন) পর্যন্ত স্বাধীনতা দাও।

খোদা সে আরজ মঞ্জুর করলেন।

ইবলিস্ তার দ্বিতীয় আবেদন পেশ করলো। বললো ঃ আমাকে লোকচক্ষে অদৃশ্য করে দাও। আর কেউ জানতে না পারে এমনি করে সকলের হাড় মাংস স্নায়ু মজ্জা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবার ক্ষমতা দাও।

খোদা তাও মঞ্জুর করলেন।

তারপর ইবলিস্ বললো ঃ লক্ষ লক্ষ বছর তোমার এবাদতে মশগুল থেকে সিজ্জীন দোজখ হতে বেহেশ্‌তে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। কিন্তু তোমার তৈয়ারি সামান্য বান্দার ওপর বেয়াদবি করার জন্য আমাকে শাস্তি দিলে। তোমার প্রিয় মানবের ওপর আমি তার প্রতিশোধ নেবো! তুমি আমাকে শয়তান করলে। আমি তোমার বান্দাকে শয়তান করে তৈরি করবো! যেমন সামান্য একটু কসুরে আমাকে নারকী করলে, তেমনি তোমার প্রিয় মানুষেরা দিন রাত তোমার রোজা নামাজ করলেও আমি তাদের সামান্য একটু ত্রুটি করবার চেষ্টা করবো, আর এমনি করে হাজার হাজার বান্দাকে দোজখে পাঠাবার ব্যবস্থা আমি করবো, আর তুমি তাদের সৎপথে চালিত করবার জন্য অনেক নবী ও পয়গম্বর পাঠাবে। তারা তাদের উদ্ধারের জন্য অনেক পরামর্শ, অনেক উপদেশ দান করবেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না। আজ থেকে তোমার মানবের অনিষ্ট করাই হবে আমার একমাত্র কাজ।

এই বলে ইবলিস্ ডানা মেলে দুনিয়ার দিকে উড়ে গেলো। সেই থেকে সে শয়তান। তার প্রতিজ্ঞা কেমন করে পূরণ করছে তা তোমরা দিন রাত দেখতে পাচ্ছ। খোদার ঈমানদারের চেয়ে শয়তানের বেঈমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তাহলে তোমরা দেখতে পেলে, ইবলিস্ লক্ষ লক্ষ বছর খোদার উপাসনা করে কত উন্নতি করেছিলো—একদিনের সামান্য একটু কসুরে তা সমস্ত নষ্ট হয়ে তার কত অধঃপতন হলো। সুতরাং তোমার জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ন্যায় ধর্ম ও সত্য পথে চলতে চেষ্টা করবে। কখনো ভুলেও এক নিমিষের জন্য একটুও ত্রুটি করবে না। জীবনের একটু কসুরও খোদা মাফ করেন না। তোমরা হয়ত মনে করবে, প্রথমে একটু আধটু কসুর করে ভাল ভাল কাজ করবে, কিন্তু তা হয় না।
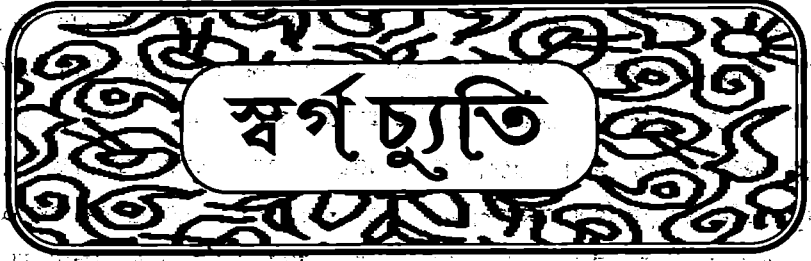
মাটির দ্বারা প্রস্তুত তুচ্ছ মানব আদমের জন্য আজাযিলের এই দুর্দশা ঘটলো। আজাযিল সেই নিরপরাধ আদমকে জব্দ করবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

খোদাতা'লা বেহেশ্‌তে বিচিত্র একটা উদ্যান রচনা করে নানারকম সুন্দর সুন্দর ফল ও ফুলের গাছ সৃষ্টি করলেন। সেই বাগানের দু'টি গাছ সৃষ্ট হলো–তার একটি নাম জীবন-বৃক্ষ, অপরটির নাম জ্ঞান-বৃক্ষ। খোদা আদমকে সেই বাগানে বাস করবার অনুমতি দিলেন। খোদা আদমকে অনুমতি দিলেন–বাগানের সমস্ত গাছের ফল সে খেতে পারে, কিন্তু জীবন-বৃক্ষ ও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল সে কখনো যেন ভক্ষণ না করে। এই গাছের ফল আহার করামাত্র তার মৃত্যু ঘটবে।

এর পরে অনেক দিন চলে যাবার পর খোদা মনে করলেন আদমের একজন সঙ্গিনী সৃষ্টি করা প্রয়োজন। একদিন তিনি সমস্ত পশুপক্ষীকে আদমের নিকটে এনে তাদের প্রত্যেকের নামকরণ করতে বললেন। আদম প্রত্যেক জীবের আলাদা আলাদা নাম রাখলেন। তারা চলে গেলে আদম চিন্তা করতে লাগলেন, খোদাতা'লা সকল জীবজন্তুকেক জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন কেবল মাত্র তিনিই একাকী রয়েছেন।

সেই রাত্রে আদম ঘুমিয়ে পড়লে খোদা তাঁর বাম পাঁজড় থেকে একটা হাড় বের করে নিয়ে তা দিয়ে একটি নারী সৃষ্টি করে তাঁর পাশে শুইয়ে রাখলেন। ঘুম ভাঙলে পাশে একটি সুন্দরী নারীকে দেখে তিনি মনে মনে পরম বিস্ময়বোধ করলেন। এমন সময়ে খোদা বললেন ঃ এর নাম বিবি হাওয়া। এ হলো তোমার সঙ্গিনী। তোমরা

দু'জনে একত্রে বেহেশ্‌তের বাগানে থাকবে, খেলবে, বেড়াবে। কিন্তু সাবধান সেদিন তোমাকে নিষেধ করেছি–আজ আবার তোমাকে ও তোমার সঙ্গিনীকে বলছি, যখন ইচ্ছে হবে এই বাগানের সকল রকম ফল আহার করবে, কিন্তু এই জীবন-বৃক্ষ ও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল কখনো আহার করবে না!

সেই দিন থেকে আদম ও হাওয়া মনের সুখে সেই বাগানের নানা রকম ফলমূল খেয়ে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন হাওয়া একা একা বাগানে বেড়াচ্ছেন। এই সুযোগে শয়তান একটা সাপের মূর্তি ধরে তাঁর কাছে এলো। সে সময়ে সিংহ, বাঘ, সাপ, গরু, হরিণ, ভেড়া, ছাগল সকলে একসঙ্গে খেলা করতো। কেউ কাউকে হিংসা করতো না। সাপ হাওয়াকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তোমরা কি এই বাগানের সব গাছের ফল খাও?

হাওয়া জবাব দিলেন ঃ না, দু'টি গাছের ফল খাওয়া আমাদের নিষেধ!

সাপ জিজ্ঞাসা করলো ঃ কোন কোন গাছের ফল তোমরা খাও না?

হাওয়া গাছ দু'টি দেখিয়ে দিলেন।

সাপ বললো ঃ কেন তোমরা এ দু'টি গাছের ফল খাও না?

হাওয়া বললেন ঃ জানি না খোদা বারণ করেছেন।

সাপ বললো ঃ খোদা তোমাদের বোকা বানিয়ে এখানে রেখেছেন। এই গাছের ফল খেলে তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলে যাবে, তোমাদের ওপরে খোদার আর কোন কারসাজি চলবে না, তাই খোদা তোমাদের এই গাছের ফল খেতে বারণ করেছেন, কি সুন্দর আর মিষ্টি এই ফল তা তোমরা জানো না।

সাপের কুপরামর্শে হাওয়ার মন দুলে উঠলো। তিনি ভাবলেন–তাইতো, অমন সুন্দর ফল না জানি কেমন মিষ্টি! তিনি লোভ সামলাতে পারলেন না। একটা ফল ছিঁড়ে নিলেন। আধখানা নিজে খেয়ে অর্ধেক আদমের জন্য নিয়ে গেলেন। আদম হাওয়ার হাত থেকে সেই নতুন রকমের ফলটুকু নিয়ে সাগ্রহে খেয়ে ফেললেন।

শয়তান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে মনে মনে হাসতে লাগলো। ফল খাবার পরে তাঁরা সর্বপ্রথম বুঝতে পারলেন যে নিজেরা বস্ত্রহীন। তখন বড় বড় ডুমুরের পাতার সঙ্গে লতা গেঁথে তাঁরা লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময়ে খোদাতা'লা আদম ও হাওয়াকে নিকটে ডাকলেন, কিন্তু তাঁরা প্রতিদিনের মতো সমুখে গেলেন না। গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন।

খোদাতা'লা বললেন ঃ আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়েছো।

আদম বললেন ঃ হাওয়া আমাকে দিয়েছে।

খোদা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ আমার আদেশ অমান্য করে যে পাপ আজ তোমরা করলে, বংশ পরম্পরাক্রমে এর ফল সকলকে ভোগ করতে হবে।

হাওয়াকে উদ্দেশ্য করে তিনি অভিশাপ দিলেন ঃ তুমি প্রসব বেদনায় অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করবার পর তোমার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। চিরকাল তোমাকে পুরুষের অধীন হয়ে থাকতে হবে। পুরুষ তোমায় শাসন করবে।

আদমকে তিনি অভিশাপ দিলেন ঃ তোমার শস্যক্ষেত্র আগাছা-কুগাছা ও নানা কাঁটা গাছে ভর্তি হয়ে যাবে। এক মুষ্টি অন্নের জন্য আ-মরণ তোমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে।

সাপকে অভিশাপ দিয়ে বললেন ঃ নির্বোধ নারীকে কুপরামর্শ দিয়ে পাপ করিয়েছ–এর শাস্তি তোমাকে সারা জীবন ভোগ করতে হবে। যে মাটিতে মানুষ পা দিয়ে চলবে সেই মাটিতে সর্বদা বুক পেতে তুমি চলবে এবং সেই খেয়ে তোমাকে জীবনধারণ করতে হবে। এই নারী বংশই হবে তোমাদের পরম শত্রু! তারা যখনই তোমাকে দেখবে তখনই বধ করার চেষ্টা করবে।

এই কথা বলে খোদা দু'খানা চামড়া তাঁদের পরিয়ে বাগান থেকে বের করে পৃথিবীতে নির্বাসন দিলেন।

হাবিল ও কাবিল

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া শয়তানের কুচক্রে পড়ে বেহেশ্তচ্যুত হলেন। তাঁরা আল্লাহ্তা'লার অভিশাপে পৃথিবীতে এসে বাস করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করতে লাগলো। হযরত আদমের বংশধরগণের মধ্যে হাবিল ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণ। তিনি রাতদিন কেবল খোদার বন্দেগীতে মশ্গুল হয়ে থাকতেন। অন্য কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো না।

ইবলিস্ আদমের ওপরে হাড়ে হাড়ে চটে ছিলো। সে কেবল সুযোগ খুঁজছিলো কি করে এঁর সন্তানগণকে পথভ্রষ্ট করা যায়। অবশেষে অনেক প্রলোভন দিয়ে কাবিল নামক পুত্রকে আপনার অধীনে আনতে সমর্থ হলো। কাবিল শয়তানের ফেরেব্বীতে পড়ে মুহূর্তের জন্য ভুলেও একবার আল্লাহ্তা'লার নাম মুখে আনতো না, বরং দিনে দিনে পাপের পথে অধিক অগ্রসর হতে লাগলো।

একদিন হাবিল ও কাবিল মনস্থ করলো যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্তা'লার উদ্দেশ্যে একটা পশুকে কোরবানি দেবে। নির্দিষ্ট দিনে উভয়ে দু'টি পশু জবেহ্ করলো। ধার্মিক ও পরহেজগার হাবিলের কোরবানি মঞ্জুর হলো, কিন্তু পাপী কাবিলের কোরবানি খোদা মঞ্জুর করলেন না।

কাবিল যখন বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ্ তার কোরবানি গ্রহণ করেননি, তখন সে মনে খুব আঘাত পেলো। সে ভাবলো যে, হাবিলের কারসাজিতেই খোদাতা'লা তার

প্রতি বিমুখ হয়েছেন। সে প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে বলে উঠলো ঃ তোকে খুন করবো হাবিল। তোর জন্যই আমার কোরবানি মঞ্জুর হলো না।

কাবিলের কথা শুনে হাবিল তো অবাক! সে কাবিলকে বললো ঃ সে কি কাবিল–আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাকে খুন করবে? তুমি যদি আমাকে খুন করো তবে আমার ও তোমার উভয়ের পাপ তোমাকে আজীবন বহন করতে হবে। তার পরে খোদাতা'লা তোমাকে এর শাস্তির জন্য দোজখে পাঠাবেন। তোমার দুর্দশার সীমা থাকবে না। তুমি এমন পাপ কখনো করো না ভাই।

হাবিলের কথায় কাবিল আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে লাফ দিয়ে হাবিলের বুকের ওপরে ওঠে গলা টিপে ধরলো। ধর্মপ্রাণ হাবিল দম বন্ধ হয়ে মারা গেলো।

হাবিলকে মেরে ফেলে কাবিল ভয়ানক বিপদে পড়ে গেলো। হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে সে চিন্তা করতে লাগলো। কি করবে, কিছুই স্থির করতে পারলো না। সে পাগলের মতো এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো। হাবিলের লাশটার কি গতি হবে তা সে ভেবে পেলো না।

এই ঘটনার পূর্বে কোন মানুষ মরে নি, খুন খারাবিও কোনো দিন হয়নি। কাজেই মৃতদেহ কিরূপে দাফন-কাফন করতে হয় তা কারুরই জানা ছিলো না।

হাবিলকে খুন করে মাথায় হাত দিয়ে কাবিল আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলো। এখন সে কি করে, কোথায় যায়, কার পরামর্শ লয়।

আল্লাহতা'লা কাবিলের বিপদ বুঝতে পেরে একটি কাককে সেই স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। কাকটি ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে মাটি খুঁড়তে লাগলো। কাকের এই ব্যাপার দেখে কাবিল যেন অকূলে কুল পেলো। এরূপভাবে মাটি খুঁড়ে হাবিলকে তো অনায়াসে মাটিতে পুতে রাখা যায়। কথাটা মনে হতেই কাবিল একখানা অস্ত্র সংগ্রহ করে এনে মাটি খুঁড়ে হাবিলকে কবর দিলো। তারপর অনুতপ্ত হয়ে ভ্রাতার শোকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

মহাপ্লাবন

হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু ধর্মের প্রতি, আল্লাহতা'লার প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণই ছিলো না। তারা দিনে দিনে অনাচারী ও পাপাচারী হয়ে উঠতে লাগলো। শেষে এমন অবস্থা হলো–পরশ্রীকাতরতা, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, ঝগড়া ও মারামারি তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে পরিগণিত হয়ে পড়লো। সর্বদা পাপাচরণ করা এবং পাপকার্যে ডুবে থাকা তাদের প্রকৃতি হয়ে উঠলো। তাদের ধর্মপথে আনবার জন্য আল্লাহতা'লা নূহ নবীকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নানা ধর্মোপদেশ দিয়ে তাদের সৎপথে আনবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত মাত্র করলো না। বরঞ্চ হাসি-মস্কারা করে এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাঁকে বেয়াকুব বানাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না। কেমন করে কাফেরদের ধর্ম পথে আনা যায় সেই কথা তিনি দিন রাত ভাবতেন। তিনি বার বার তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু তারা উত্যক্ত হয়ে মাঝে সাঝে তাঁকে প্রহার এবং নির্যাতন করতে শুরু করলো। নির্মম প্রহারের ফলে কখনো কখনো অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। হুঁশ হলে পুনরায় পাপাচারীদের সদুপদেশ দিতেন। এমনি করে অনেকদিন কেটে গেলো। অবশেষে তিনি হতাশ ও বিরক্ত হয়ে খোদার দরগায় হাত তুলে প্রার্থনা জানালেন ঃ হে রহমান রহিম, আমি তোমার আদেশ বহন করে কাফেরদের মধ্যে এসে তাদের ধর্ম পথে আনবার জন্য সহস্র প্রকার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমাকে গ্রহণ করেনি–তোমাকে মর্যাদা দেয়নি। তোমার পুনরাদেশের প্রতীক্ষায় আমি রয়েছি। তুমি আমার কর্তব্য নির্ধারণ করো।

তাঁর প্রার্থনা খোদার আরশে গিয়ে পৌঁছালো। তিনি জিবরাইল ফেরেশ্‌তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

জিবরাইল নূহ্‌কে খবর দিলেন ঃ খোদাতা'লা দুনিয়ার ভার আর সহ্য করতে পারছেন না, তিনি শীঘ্রই মহাপ্লাবন দ্বারা দুনিয়া ধ্বংস করবেন বলে স্থির করেছেন। তিনি তোমাকে এবং তোমার পুত্র-কন্যাদের অতিশয় স্নেহ্ করেন। তাই তোমাদের রক্ষা করবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

নূহ্ প্রশ্ন করলেন ঃ কি করে আমরা রক্ষা পাবো?

জিবরাইল জবাব দিলেন ঃ একটা মস্ত বড় জাহাজ নির্মাণ করো, তারপর কি করতে হবে পরে জানতে পারবে।

জিবরাইলের পরামর্শ অনুযায়ী নূহ জাহাজ তৈরি করতে লাগলেন। অনেক দিন ধরে অনেক পরিশ্রম ও পরিকল্পনায় একটি জাহাজ নির্মাণ সমাপ্ত হলো। জাহাজটি এত বড় হয়েছিলো যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ তেমনটি দেখেনি। লম্বায় দু'হাজার হাত এবং চওড়ায় আটশ' হাত আর উঁচু হয়েছিল ছয়শ' হাত।

জাহাজ প্রস্তুত হয়ে গেলে জিবরাইল একদিন দেখতে এলেন। নূহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কেমন করে জানতে পারবো কোন দিন মহাপ্লাবন আরম্ভ হবে? আর সে সময় আমাকে কি করতে হবে?

জিবরাইল বললেন ঃ যখন রান্নার চুল্লি থেকে হু-হু করে পানি উঠবে তখন বুঝবে যে মহাপ্লাবনের আর দেরী নেই। তখন তুমি যত প্রকার পশুপক্ষী আছে প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া জাহাজে তুলে নেবার ব্যবস্থা করবে। তারপর তোমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ জাহাজে উঠবে।

কয়েকদিন পরে এক অপরাহ্নে কাফেররা নূহের কাছে এসে বললো ঃ জাহাজ তো তৈরি করলে নূহ সাহেব, কিন্তু এর দ্বারা করবে কি? কাছে তো নদী সাগর কিছু নেই তোমার জাহাজ ভাসবে কোথায়? মাটির ওপর দিয়ে তোমার জাহাজ চলবে নাকি? এই জাহাজে চড়ে তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যাবে নাকি?—এই বলে তারা নিজেদের রসিকতার দাঁত বের করে হো হো হাসতে হাসতে চলে গেল।

নূহ একদৃষ্টে তাদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন ঃ খোদা, সৎপথে আসবার মতো বুদ্ধি এদের দাও।

একদিন নূহ নবীর স্ত্রী ভাত রাঁধছিলেন। এমন সময় জ্বলন্ত চুলা থেকে হু-হু করে পানি উঠতে লাগলো। তিনি ছুটে গিয়ে স্বামীকে এ সংবাদ জানালেন, নূহ বুঝতে পারলেন প্লাবনের আর বেশি দেরি নেই। তিনি সকল রকম পশু-পক্ষী এক এক জোড়া জাহাজে তুলবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর কাজ শেষ হলে আল্লাহতা'লা আসমানের দরজা খুলে দিলেন। ঝম ঝম করে অজস্র-ধারায় অবিরাম বৃষ্টি ঝরতে লাগলো। চল্লিশ দিন অবিরাম বৃষ্টি। গাছপালা ঘরবাড়ি পাহাড় পর্বত সমস্ত ডুবে একাকার হয়ে গেলো।

নূহের জাহাজ পানির উপর ভেসে বেড়াতে লাগলো। একদিন দু'দিন করে এক মাস ক্রমে ছয় মাস আটদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। দুর্যোগ কেটে সুবাতাস বইতে আরম্ভ করলো। আস্তে আস্তে পানি কমতে শুরু হলো।

জাহাজ তখনো এদিক-ওদিক চলছিল! চলতে চলতে একদিন জুদী নামক একটি পাহাড়ে জাহাজ এসে ঠেকলো। জাহাজ থেকে নামবার সময় হয়েছে কিনা নূহ বুঝতে না পেরে দাঁড়কাক দু'টিকে ছেড়ে দিলেন। চারদিকে পচা জীব-জন্তুর মৃতদেহ পেয়ে দাঁড়কাকেরা মনের আনন্দে তা ভক্ষণ করতে লাগলো। সুতরাং জাহাজে ফিরে যাবার কথা আর তাদের মনেই রইলো না।

দাঁড়কাকের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে নূহ পায়রাদের ছেড়ে দিলেন। পায়রারা কিছুক্ষণ পড়ে কচি পাতা সুদ্ধ একটি ছোট ডাল ঠোঁটে করে নিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এলো। নূহ বুঝতে পারলেন পানি কমে গেছে এবং গাছে কচি পাতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ থেকে তিনি অনুমান করতে পারলেন না যে, এখন জাহাজ থেকে নামবার সময় হয়েছে কি না। অতঃপর তিনি একটি মোরগকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিলেন। পানি একেবারে কমে যাওয়ায় মাটির ওপরে নানা রকম মরা পোকা-মাকড় দেখতে পেয়ে সে আর জাহাজে ফিরে গেলো না। এবারে নূহ বুঝতে পারলেন যে, পানি প্রায় শুকিয়ে গেছে, এখন জাহাজ থেকে নামবার সময় হয়েছে। আদেশ না পেলে তো জাহাজ থেকে অবতরণ করতে পারেন না। সুতরাং তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

আরো দিন কয়েক কেটে যাবার পর একদিন জিবরাইল এসে তাঁকে জাহাজ থেকে নামতে বললেন। তাঁর কথামত নূহ তাঁর পরিবারবর্গ এবং জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতি নিয়ে জাহাজ থেকে নামলেন। এবারে তিনি যেন নতুন দুনিয়া দেখলেন। খোদা যেন মহাপ্লাবন দিয়ে ধরণীর সমস্ত পাপ একেবারে ধুয়ে-মুছে দিয়েছেন। তিনি সুখ ও সম্ভোগের সঙ্গে পুনরায় বসবাস করতে আরম্ভ করলেন

মহাপ্লাবনের পর বহু বছর কেটে গেছে।

আরবে আদ নামক একটা জাতি অতিশয় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। তারা খোদাকে মানতো না—ইচ্ছা মতো যা খুশী করতো। কখনো পাথর, কখনো পুতুল, কখনো গাছপালাকে পূজা করতো। খোদাতা'লা তাদের হেদায়েত করার জন্য হুদ (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন। হুদ তাদের এই কুকার্য দেখে মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হলেন। তিনি আপনার জাতিবর্গকে ডেকে বললেন ঃ তোমাদের কুপথ থেকে সৎপথে আনবার জন্য খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন। যদি তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান না আন তবে তিনি কঠিন গজব তোমাদের উপরে নাজেল করবেন। তোমরা আল্লাহতা'লার এবাদত করো। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নাই। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। তিনি দয়ালু ও মহান।

কাফেররা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তুমি কি ভেবেছো যে, তোমার কথা মতো আমাদের ধর্ম ছেড়ে তোমার নিরাকার আল্লাহ্র এবাদত করবো? ও সব চালাকী আমাদের কাছে চলবে না। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তবে মেরে তোমার হাড়গুঁড়ো করে দেবো। হযরত হুদ তাদের কথা গ্রাহ্য মাত্র করলেন না। তিনি এই কুপথগামী লোকদের ধর্ম পথে আনবার জন্য যথাসাধ্য উপদেশ দিতে লাগলেন। মাত্র অল্প কয়েকজন লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস করে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলো। অধিকাংশ লোকই তাঁর উপদেশ শুনলো না, অবহেলা ভরে বললো ঃ হুদ! তুমি তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। বড় বড় বক্তৃতা করে আমাদের মধ্যে সম্মান লাভ করতে চাও এই তো তোমার উদ্দেশ্য। যদি আল্লাহতা'লার শিক্ষা দেবার দরকার হয়,

তাহলে তিনি অন্যভাবে আমাদের শিক্ষা দিবেন। এজন্য তুমি এত মাথা ঘামাও কেন? তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে, আমাদের জন্য ভেবো না।

হযরত হুদ যখন লোকদের সৎপথে আনতে পারলেন না, তখন তিনি নিরুপায় হয়ে আল্লাহতা'লার নিকট মনের দুঃখে আরজ করতে লাগলেন ঃ হে রহমান রহিম আমার কথায় এরা কর্ণপাত মাত্র করলো না। এরা বড় পাপী। তুমি ছাড়া এদের শিক্ষা দিতে পারে এমন আর কেউ নেই। তুমি এদের কঠিন শাস্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও তোমার মহান অস্তিত্ব। তুমি সর্বশক্তিমান–তুমি এদের চেতনা জাগ্রত করো।

খোদাতা'লা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এরপর হুদ ধর্ম প্রচার বন্ধ রেখে নীরবে নিজের ঘর-সংসারের কাজে মনঃসংযোগ করলেন।

কাফেররা হুদকে এইরূপে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। সবাই বলতে লাগলো। হুদ এবার ঠিক বুঝেছে, আমাদের ঠকানো অত সোজা নয়–তাই চুপচাপ বসে গেছে ঘর সংসার নিয়ে। বেচারা এতো গলাবাজি করলো বটে কিন্তু সবই পণ্ড হলো।

একদিন আল্লাহ্ হযরত হুদকে জানিয়ে দিলেন ঃ এবার পৃথিবীতে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হবে। তোমার পরিজনবর্গ এবং সামান্য দু'চারজন অনুচর যা আছে তাদের সঙ্গে নিয়ে একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করো।

খোদার আদেশ পেয়ে হুদ আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে একটি গহ্বরে গিয়ে লুকালেন। অতঃপর ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হলো। প্রবল ঝড় ও ঘূর্ণিবায়ুতে মাটির ওপরে ঘরবাড়ি গাছপালা কিছুই আর দাঁড়িয়ে রইলো না, সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেলো।

তারপর ধীরে ধীরে প্রকৃতি শান্ত হলো। তখন দেখা গেলো আদ জাতির লোকদের ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র নেই এবং তারাও সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

খোদা পাপীদের এই রকমেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।

ছামুদ জাতি আরবের অন্তর্গত হজর ও ওয়াদিলকোর অঞ্চলে বাস করতো। তারা পাথর কেটে সুন্দর গৃহ নির্মাণ করতে জানতো। জীবজন্তু মারবার জন্যে পাথর কেটে আশ্চর্য রকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতো। এদের মধ্যে কতক শ্রেণীর লোক পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। এরা আল্লাহতা'লাকে মানতো। যা কিছু বড় এবং অদ্ভুত তাদের চক্ষে লাগতো তারই প্রতিমূর্তি পাথর দ্বারা তৈরি করে পূজা করতো। তাছাড়া দিনরাত ঝগড়া ও দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে থাকতো। আল্লাহতা'লা তাদের মধ্যে হযরত ছালেহ্‌কে নবীরূপে পাঠালেন। হযরত ছালেহ্ তাদের ডেকে বললেন ঃ ভাইসব খোদা তোমাদের এই মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, আবার এই মাটিতেই লয় করবেন। তাঁর কথা একবার ভেবে দেখ, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। তোমরা অজ্ঞান-অন্ধকারে পড়ে আছ। আজ তোমাদের কাছে আমি পরমার্থিক আলো নিয়ে এসেছি। মনে করে দেখ আদ জাতি হযরত হুদের কথা শোনেনি–এজন্য তারা কিরূপভাবে তোমাদের সামনেই ধ্বংস হয়ে গেলো। যার কৃপায় এই পাহাড়ের ওপরে এমন সুন্দর গৃহ নির্মাণ করে বাস করছো তাঁর কথা একবার চিন্তা করো।

একদল লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলো। কিন্তু যারা অর্থশালী, বলশালী এবং নিজেদের খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে মনে করতো, তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত মাত্র করলো না। বরঞ্চ তাঁরা হিতোপদেশে উত্যক্ত হয়ে তারা তাঁর প্রতি খড়গহস্ত হয়ে উঠলো এবং দিনরাত ষড়যন্ত্র করতে লাগলো, কি করে হযরত ছালেহ্ ও তাঁর অনুচরবর্গকে হত্যা করা যায়। অবশেষে একদিন গভীর রাত্র তারা ছালেহ্ ও তার অনুচরবর্গকে আক্রমণ করলো, কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাদের সকল অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেলো। ছালেহ্ ও তার অনুচরবর্গ অক্ষত দেহে রক্ষা পেলো, কিন্তু আততায়িগণ সদলে ধ্বংস হলো।

ছামুদেরা বিধ্বস্ত হলে কাফেররা অক্ষত অধিকতর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলো। তারা ছালেহকে মারবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সামাজিকভাবে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করবার জন্য সর্বদা উপহাস ও বিদ্রূপ করতে লাগলো। তাদের মধ্য হতে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ছালেহকে ডেকে বললেন ঃ তুমি যে আল্লাহ্‌র নবীরূপে আমাদের কাছে এসেছো বলছো, কি করে আমরা বুঝতে পারবো যে, তুমি সত্যই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর।

ছালেহ্ তখন আল্লাহ্ পাকের কাছে আরজ করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তার প্রার্থনা কবুল করলেন এবং নিকটবর্তী পাহাড় দ্বিখণ্ডিত করে তার মধ্যে থেকে একটা উট বের করে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ছালেহ্ সেই উটকে নিয়ে কাফেরদের কাছে গেলেন। বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে তাঁর চিহ্ন দেখতে চেয়েছো তাই খোদাতা'লা এই উটটিকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তোমরা কেউ এর অনিষ্ট করো না, বরং একে ঘাস ও পানি দিও। এর প্রতি অত্যাচার করলে খোদার গজব (রোষ) তোমাদের ওপরে পতিত হবে।

কাফেররা উটটিকে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো। তারা মনে করলো এটা একটা সামান্য জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়, ছালেহ্ শুধু তাদের ভয় দেখাবার জন্য এটিকে এনেছে। খোদার প্রেরিত কোন চিহ্নই এর গায়ে নেই। এ রকম উট তো তারা হামেশাই জবেহ্ করে ভক্ষণ করছে! একে যদি নিত্য খাদ্য ও পানি দেওয়া হয় তাহলে তাদের জন্তগুলো আধপেটা খেয়ে মরার শামিল হয়ে পড়বে। তার চেয়ে এই উটটিকে রাত্রিকালে হত্যা করে সকলে ফলার করবে।

উটটিকে বধ করেও যখন তাদের কোন অনিষ্ট হলো না, তখন তারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। তাহারা হযরত ছালেহকে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রূপ করতে লাগলো। অবশেষে এমন দুর্গতি তাঁর করলো যে, দেশে বাস করা তাঁর দায় হয়ে উঠলো। তিনি নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে দুই হাত তুলে প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ হে করুণাময়, হে দ্বীন-দুনিয়ার মালিক। আমি কিছুতেই এদের ভ্রম ঘুচাতে পারলাম না। তুমি যদি এদের শাস্তি না দাও, তবে হয়তো শীঘ্রই এরা আমাদের বধ করবে। তুমি উপযুক্ত বিচার করো।

তাঁর প্রার্থনা আল্লাহ্ মঞ্জুর করলেন।

এই ঘটনার তিন দিন পরে রাত্রিশেষে ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হলো। অবিশ্বাসী ছামুদদের ঘরবাড়ি সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো এবং তারাও সেই ভগ্নস্তূপের নিচে সমাধি লাভ করলো। পৃথিবীর বুকে জীবিত রইলেন হযরত ছালেহ্ ও তাঁর অনুচরবর্গ।

বেবিলন দেশের নাম হয়তো তোমরা শুনেছো। সেই দেশের সম্রাট নমরূদ ছিলেন যেমন অহঙ্কারী তেমনি অত্যাচারি। রাজকোষে ছিল তাঁর প্রচুর মণিরত্ন, ধন-ঐশ্বর্য-দেহে বীর্য, অগণিত লোক-লস্কর।

একবার অগণিত সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি অভিযানে বের হলেন। দেশের পর দেশ তাঁর করায়ত্ত হতে লাগলো। চারদিকে বয়ে গেলো রক্তের নদী-শোনা যেতে লাগলো নিপীড়িতের আর্তনাদ-দুর্বলের হাহাকার-বুকফাটা ক্রন্দন। তবু বিরাম নাই-বিশ্রাম নাই-শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস-জয় আর জয়। গ্রীস, তুরস্ক, আরব, পারস্য ও পাকভারতে তাঁর বিজয়-নিশান উড়তে লাগলো। তিনি হলেন অর্ধ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। দম্ভে তাঁর বুক উঠলো ফুলে-দুনিয়াটাকে খেলাঘর বলে তাঁর মনে হতে লাগলো।

একদিন নমরূদ আম্-দরবারে বসে অমাত্য-পারিষদ নিয়ে খোশগল্পে মশ্গুল আছেন, এমন সময়ে একজন ফকির এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলো ঃ সর্বশক্তিমান খোদার নামে কিছু দান করুন জাহাঁপনা।

নমরূদ এ কথা শুনে চমকে উঠলেন। বললেন ঃ সর্বশক্তিমান খোদা? সে কি বলছো তুমি? সর্বশক্তিমান আমি।

সম্রাটের কথার ওপরে কথা চলে না-সুতরাং অমাত্যবর্গ ক্ষুণ্নমনে নীরব হয়ে রইলেন।

ফকির বললো ঃ জাহাঁপনা আপনি ভুল করছেন-এমন পাপকথা মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে নেই। তিনি এতো বিরাট যে, তাঁর তুলনায় আপনি অতিশয় তুচ্ছ।

নমরূদ ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন ঃ এতো বড় স্পর্ধা! আমার কথার ওপরে কথা!! প্রতিহারী-

প্রতিহারী এসে জোড়হাতে আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলো ঃ নমরূদ ক্ষিপ্তকণ্ঠে হুকুম করলেন ঃ এই ভিখারীটার গর্দান চাই।

প্রতিহারী ফকিরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শিরশ্ছেদের জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলো।

অমাত্যবর্গ তাঁদের সম্রাটকে চিনতেন, তাই তাঁরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলেন না; কিন্তু মনে মনে দুঃখ বোধ করতে লাগলেন।

নমরূদ সভাসদদের ডেকে বললেন ঃ আপনারা আজই আমার রাজ্য মধ্যে প্রচার করে দিন, আমি সর্বশক্তিমান–আমি খোদা। যে আমাকে ছাড়া অন্য খোদার বন্দনা করবে সে সবংশে ধ্বংস হবে।

অমাত্যগণ নিরুপায়। তাঁরা তখনই রাজাদেশ দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

দেশের লোকেরা আতঙ্কে শিউরে উঠলো। অন্তঃপুরে মেয়েরা কানে আঙ্গুল দিলো। সামান্য মানুষের এমন স্পর্ধা। বামন হয়ে আকাশে খেলাঘর নির্মাণের সাধ! কিন্তু প্রতিকার নেই। গোপনে গোপনে তারা উপাসনা করতে লাগলো। প্রকাশ্যে নমরূদের আদেশ পালন করবার ভান করা ছাড়া কোনো উপায় রইলো না। নমরূদ অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; সুতরাং দিনে দিনে স্পর্ধা তাঁর বেড়েই চলেছিলো। আপনার নানা রকমের মূর্তি নির্মাণ করিয়ে প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে রেখে দিয়ে রাজধানীর সকলের ওপরে আদেশ দিলেন ঃ দুধ আর কলা দিয়ে আমার মূর্তি পূজা করতে হবে। যে আদেশ অমান্য করবে তার গর্দান যাবে।

প্রাণের দায়ে সবাই নমরূদের খেয়াল অনুসারেই চলতে লাগলো। নমরূদের অনুগত ভৃত্য আজর প্রভু-অন্তপ্রাণ। তাঁর দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র ইব্রাহিম একদিন এমন কাজ করলেন যা দেখে আতঙ্কে সকলের বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হলো।

নমরূদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়েছিলেন কোনো উৎসবে যোগদান করতে। প্রাসাদে ফিরে এসে দেখতে পেলেন তাঁর প্রতিমূর্তিগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। নমরূদ সেদিক পানে চেয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে চিৎকার করে বললেন ঃ কে এ-কাজ করলো?

ইব্রাহিম নির্ভয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন ঃ আমি করেছি। সকলে বালকের দুঃসাহস দেখে বিস্মিত হলো। এই নির্ভীকতার যে কী পরিণাম, তা কল্পনা করে সকলে শিউরে উঠলো।

নমরূদ ভ্রু কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন ঃ কেন? কেন করলে?

ইব্‌রাহিম সাহসে বুক ফুলিয়ে বললেন ঃ যে সামান্য মানুষ হয়ে খোদা হবার স্পর্ধা করে তাঁর শাস্তি দিয়েছি। এখনো সাবধান হোন জাহাঁপনা–নইলে খোদা আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

অমাত্যবর্গ অবাক। এতো বড় উচিত কথা মুখের ওপর কেউ কোনদিন তাঁকে বলেনি।

নমরূদ হুঙ্কার দিলেন ঃ এই, কে আছিস?

মুক্ত তরবারি হস্তে প্রতিহারী এসে কুর্ণিশ জানালো।

নমরূদ হুকুম করলেন। এই মুহূর্তে এর গর্দান চাই।

জল্লাদের হাতের অস্ত্র উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করে উঠলো। নমরূদ তাকে থামবার ইঙ্গিত জানিয়ে দু'হাত আন্দোলিত করে বললেন ঃ না–না না, বধ করো না–এত আরামে এর মৃত্যু হতে পারে না। একে আগুনে দগ্ধ করে হত্যা করতে হবে। তোমরা সবাই কাঠের যোগাড় করো।

জীবন্ত মানব দগ্ধ করা একটা কৌতূককর ব্যাপার। সুতরাং লোক-লস্কর, পাইক-সেপাই বনবাদাড় উজাড় করে শহরের বাইরে এক ময়দানে কাঠ স্তূপ করতে লাগলো। কিছুকাল পরে একটি নির্দিষ্ট দিনে বিরাট স্তূপীকৃত কাঠের ওপরে ঘি ঢেলে এমন অগ্নিকুন্ড করা হলো যার তাপে এক মাইলের মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে–নমরূদ সেদিক পানে চেয়ে চিৎকার করে বললেন ঃ শীঘ্রই ইব্‌রাহিমকে আগুনের মধ্যে ফেলে দাও।

সিপাহী-শান্ত্রী করজোড়ে নিবেদন করলো ঃ জাহাঁপনা, আধমাইলের মধ্যে যে সব পাখি উড়ছিলো তারা অবধি পুড়ে মরে গেছে। আগুনের নিকটবর্তী না হলে কি করে আমরা ইব্‌রাহিমকে ওর মধ্যে ফেলতে পারি।

নমরূদ দেখলেন কথাটা সত্য, কিন্তু তথাপি মুখ বিকৃত করে চিৎকার করে উঠলেন ঃ তবে কি তাকে রেহাই দিতে চাও নাকি? কাঠের সঙ্গে কাঠ বেঁধে চরকির মতো তৈরি করো–তার সঙ্গে ইব্‌রাহিমকে বেঁধে দূর থেকে নিক্ষেপ করো।

ঠিক-ঠিক, একথাটা কারুর মনেই হয়নি। ইব্‌রাহিমকে আগুনে ফেলতে না পেরে উৎসাহটা কেমন ঝিমিয়ে এসেছিলো। সুতরাং এবার সকলেই পৈশাচিক আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলো।

নমরূদের হুকুম মতো চরকির কাঠের আগায় ইব্‌রাহিমকে বেঁধে কয়েক পাক ঘুরিয়ে দূর থেকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য, যে প্রচণ্ড আগুনের লেলিহান শিখা এতক্ষণ দাউ-দাউ করে জ্বলছিলো-ইব্‌রাহিম আগুনে পড়বামাত্র আগুনের ফুলকিগুলো বিচিত্র রঙের ফুলে পরিণত হলো। যে সকল কাঠ অগ্নিদগ্ধ হয়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছিল মুহূর্ত মধ্যে সেগুলো পত্র পুষ্প ভরে উঠলো। দেখতে দেখতে সেই ভীষণ অগ্নিকুন্ড পুষ্প উদ্যানে পরিণত হলো। তার মধ্যে ইব্‌রাহিম এক জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বসে হাসছেন।

নমরূদ এই অভাবনীয় কান্ড দেখে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলেন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই-পরক্ষণেই চীৎকার করে বললেন ঃ হতভাগাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলো।

নমরূদের হুকুম পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, একটা পাথরের কণাও তাঁর গায়ে আঘাত করলো না-সব পাথর জমাট বেঁধে মেঘের রূপ ধরে ইব্‌রাহিমের মাথার উপরে ছায়া করে রইলো

ব্যাপার দেখে নমরূদ বুঝতে পারলেন অনুচরবর্গকে বেশি দিন শক্তিসামর্থ্যের কথা গায়ের জোরে বিশ্বাস করানো চলবে না-কিন্তু বাইরে সে কথা প্রকাশ করলেন না। বললেন ঃ ও ছোকরা যাদু জানে-যাদুবিদ্যার গুণে এসব করছে।

ইব্‌রাহিম আগুন থেকে বেরিয়ে এসে নমরূদকে ডেকে উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ দেখলেন জাহাঁপনা খোদা যাকে রক্ষা করেন-কেউ তাকে মারতে পারে না। তাই বলছি, অহঙ্কার ত্যাগ করে খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

নমরূদ বিরস কণ্ঠে বললেন ঃ তোর খোদার নিকটে তো কিছু আমি চাই না, তবে নিরর্থক তাকে মানতে যাবো কেন?

ইব্‌রাহিম বললেন ঃ এখন চান না বটে, কিন্তু আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি-এই সাম্রাজ্য তিনিই আপনাকে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন।

নমরূদ ক্রোধে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন। হুঙ্কার ছাড়লেন ঃ এতোবড় স্পর্ধা! তোর খোদা আমাদের ধ্বংস করবে। শোন ইব্‌রাহিম তোর খোদাকে খুন করে আমি তার রাজ্য কেড়ে নেবো।

কিন্তু খোদা যে আকাশে থাকেন এই নিয়েই বাঁধলো গোল, সেখানে যাওয়া যাবে কি উপায়ে তাই হলো নমরূদের চিন্তার বিষয়।

মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ-সভা বসলো। অনেক বাদানুবাদ এবং বিতর্কের পর মন্ত্রীরা একমত হয়ে অভিমত প্রকাশ করলেন, যদি চারিটি শুকুনি সংগ্রহ করা যায়, তবে একটি জলচৌকির চারি-পাশে তাদের বেঁধে প্রত্যেকের মুখের সম্মুখে কিছু দূরে মাংসখন্ড ঝুলিয়ে রাখলেই তারা মাংসের লোভে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে–তাহলে আকাশের ওপরে খোদার দেশে যেতে পারা যাবে।

যুক্তিটা নমরূদের মনঃপুত হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ শকুনি ধরে আনবার জন্যে সিপাহী–শাস্ত্রীর ওপরে হুকুম করলেন।

গোটা চারেক শকুনি অতি অল্প দিনেই সংগৃহীত হয়ে গেলো। অতঃপর নমরূদ একদিন প্রচার করলেন, তিনি খোদাকে হত্যা করবার জন্য আকাশে উঠবেন।

এই অভাবনীয় কান্ড দেখবার জন্যে রাজ্যের চারিদিক থেকে দলে দলে লোক প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন।

যথাসময়ে জলচৌকির চারটা খুঁটির সঙ্গে শকুন চারটাকে বেঁধে মুখের খানিকটা ওপর মাংসখন্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হলো নমরূদ দু'জন সঙ্গী নিয়ে সেই চৌকির ওপরে গিয়ে বসলেন। শকুনগুলো মাংসের লোভে উড়তে শুরু করলো।

উড়তে উড়তে মেঘলোক পার হয়ে আরো ওপরে–আরো ওপরে–এত ওপরে উঠলো যে, পৃথিবীকে একটা ধোঁয়ার মতো মনে হতে লাগলো। নমরূদ নিচের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন। যদি দড়ি ছিঁড়ে জলচৌকিটা পড়ে যায়–কী যে দশা ঘটবে ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু সঙ্গী দু'জনের কাছে তাঁর ভয়ের কথা তিনি গোপন করলেন। বললেন ঃ আমরা তবে এবার ইব্‌রাহিমের খোদার রাজ্যে এসেছি। শুনেছি তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। তাও নাই বা গেলো–চারিদিকে তীর ছুঁড়ি, যেখানেই থাকে–দফা ঠান্ডা হবে। এই বলে তিনি চারদিকে তীর ছুঁড়তে শুরু করলেন।

খোদাতা'লা স্বর্গদূত জিবরাইলকে বললেন ঃ নমরূপ অনেক আশা করে আমাকে বধ করতে এসেছে। যে আমার নিকট যা চেয়েছে আমি তাকে তা দিয়েছি। তুমি নমরূদের তীরগুলো ধরে প্রত্যেক ফলকের আগায় মাছের রক্ত মাখিয়ে নমরূদকে ফিরিয়ে দাও। তাকে নিরাশ করো না।

খোদার আদেশ মতো স্বর্গদূত জিব্রাইল মৎস্যের নিকটে রক্ত চাইতে গেলো। মৎস্য বললো ঃ খোদা যেন আমাকে ক্ষমা করেন, একজন ধর্মদ্রোহীতার জন্য রক্ত দিতে আমি স্বীকৃত নই।

জিব্রাইল বললেন ঃ তুমি রক্ত দান কর। দয়ালু খোদা তার প্রতিদানের এই সুযোগ তোমাকে প্রদান করবেন, কোন পশু জীবিতাবস্থায় বধ না করলে মানবগণ তার মাংস আহার করবে না, কিন্তু তুমি জীবিত বা মৃত অবস্থাতেই মানবের ভক্ষ্য হবে।

তিমী, বেলে ইত্যাদি মৎস্য আনন্দের সঙ্গে স্বীকৃত হয়ে রক্ত দান করলো। সেদিন হতে তাদের দেহ এখন অবধি রক্তহীন, তোমরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে।

নমরূদের চৌকির উপর রক্তমাখা তীর এসে পড়তে লাগলো। তীরের অগ্রভাগে রক্ত দেখে আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর শত্রু–তার প্রতিদ্বন্দ্বী খোদা তবে মারা পড়েছেন! যাক্–এতদিনে নিষ্কন্টক হওয়া গেল।

নমরূদ নিচে নামবার জন্য মাংসের টুকরোগুলো শকুনির মুখের নিচে ঘুরিয়ে দিলেন। শকুনিগুলো শাঁ-শাঁ শব্দে পৃথিবীর দিকে দ্রুত বেগে নেমে এলো।

নমরূদ মাটিতে নেমে রক্তমাখা তীরগুলো সমবেত প্রজাদের দেখিয়ে বললেন ঃ ইবরাহিমের খোদাকে আমি হত্যা করে এসেছি। এই দেখ তীরের আগায় তাঁর দেহের রক্ত।

সকলে একবাক্যে তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। ইব্রাহিমও সেই জনতার মধ্যে ছিলেন। তিনি নমরূদের সমুখে এগিয়ে এলেন। বললেন ঃ খোদাকে কেউ কখনো হত্যা করতে পারবে না।

নমরূদ খুশীভরা কণ্ঠে বললেন ঃ মূর্খ ইব্রাহিম, বিশ্বাস কর–এইমাত্র তাঁকে বধ করে আমি ফিরছি। তোর বিশ্বাস না হয়–তাঁকে ডেকে দ্যাখ–তিনি কেমন করে তোর কাছে আসেন দেখি।

ইব্রাহিম জবাব দিলেন ঃ তাঁকে কোথাও যেতে আসতে হয় না–তিনি সব জায়গাতেই সব সময়ে রয়েছেন।

নমরূদ বললেন ঃ বিশ্বাস করলি না ইব্‌রাহিম? তোর খোদা যদি জীবিতই থাকেন তবে তাঁকে বল সৈন্যসামন্ত যোগাড় করতে–আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

ইব্‌রাহিম প্রত্যুত্তর করলেন ঃ তাঁর সৈন্য সর্বদা প্রস্তুত, আপনি বরঞ্চ প্রস্তুত হোন। যখন বলবেন তখনই তিনি রাজি।

এ কথায় নমরূদ মনে মনে ভীত হলেন–সত্যই কি তবে ইব্‌রাহিমের খোদা মারা যাননি।

সেদিন হতে নমরূদ সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। বহু নতুন সৈন্য নিযুক্ত হতে লাগলো। নমরূদ তাঁর অধীন রাজন্যবর্গের নিকটে সৈন্য চেয়ে পাঠালে অল্প দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সেনা সংগৃহীত হয়ে গেলো।

ইব্‌রাহিম খোদার নিকট আবেদন জানালেন ঃ হে নিখিল পতি, হে সর্বশক্তিমান একজন সামান্য মানুষ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি তাকে সাজা দিয়ে সমগ্র ধর্মদ্রোহীকে বুঝিয়ে দাও, তোমার বিরুদ্ধাচরণ যারা করে তারা তোমার রোষ থেকে ক্ষমা পায় না। হে প্রভু, যদি তাদের ক্ষমা করো তবে তোমাকে যে কেউ মানতে চাইবে না। তাকে শাস্তি দেবার জন্যে আমাকেও সাহায্য করো।

এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে দৈববাণী শুনতে পাওয়া গেল ঃ কিরূপ শাস্তি তুমি পছন্দ করো–কি সাহায্য তুমি চাও?

ইব্‌রাহিম বললেন ঃ তুমি সর্বজ্ঞ, তোমাকে নতুন করে কি বলবো প্রভু! তবে আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার সৃষ্টির অতি ক্ষুদ্র এবং অতি দুর্বল প্রাণী দিয়ে নমরূদের সৈন্যগণকে হত্যা করো। ধর্মদ্রোহীরা বুঝুক, তোমার লীলা কি বিচিত্র–কত রহস্যময়।

পুনরায় দৈববাণী হলো ঃ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

এদিকে নমরূদ ইব্‌রাহিমকে যথাসময়ে সংবাদ পাঠালেন তাঁর সৈন্য প্রস্তুত–এবার তিনি খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইচ্ছা করেন।

এই সংবাদ শুনে ইব্রাহিম নির্দিষ্ট দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে নমরূদের সৈন্যরা যেখানে খোদার প্রেরিত সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করছিলো, সেখানে এলেন। নমরূদকে ডেকে বললেন ঃ খোদার সৈন্য এবারে যুদ্ধে আসছে– আপনারা প্রস্তুত হোন।

নমরূদ এবং তাঁর সৈন্যরা চেয়ে দেখলো দূরে 'কাফ' পর্বতের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র–সেই ছিদ্র হতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মশা ভন্ ভন্ শব্দে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে উড়ে আসতে শুরু করেছে।

নমরূদ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। বললেন ঃ ইব্রাহিম পালে পালে মশা আসছে দেখতে পাচ্ছি। ঐ কি তোমার খোদার সৈন্য।

ইব্রাহিম বললেন ঃ ওরাই খোদার সৈন্য, ওদের অস্ত্রই আপনার সৈন্যগণ আগে সহ্য করুক—পরে অন্যরূপ ব্যবস্থা হবে।

নমরূদ অবজ্ঞাভরে বললেন ঃ তবে যুদ্ধ আরম্ভ হোক।

তাঁর আদেশ পেয়ে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো।

অমনি মশারা নমরূদের লোক-লস্করের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এক একটি মশা একজন সৈন্যের নাকের ছিদ্রপথে মস্তকে প্রবেশ করে এমন বিষম কামড় দিতে আরম্ভ করলো যে, তারা যন্ত্রণায় নাচতে শুরু করলো। যাতনা সহ্য করতে না পেরে হাতের গদা দিয়ে তারা পরস্পরের মাথায় আঘাত করতে লাগলো। নিদারুণ আঘাতে অনেকেই ভূমিশয্যা গ্রহণ করলো।

কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়। দলে দলে মশা তাদের মাথার ওপরে ভন্ ভন্ করতে করতে যেতে লাগলো। একে একে সমস্ত সৈন্যের জীবনলীলা এমনি করে শেষ হলো।

বেগতিক দেখে নমরূদও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে সুড়ুৎ করে একটা মশা তাঁর নাকের মধ্যে প্রবেশ করলো। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি প্রাসাদের দিকে ছুটে চললেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে তিনি হেকিমকে হুকুম করলেন মস্তক থেকে মশা বের করে দিতে। শত রকমের ওষুধ সহস্র রকমের প্রক্রিয়া—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মশার কামড়ের যন্ত্রণায় প্রাণ যায় আর কি! নমরূদ কাতর হয়ে পড়লেন। একজন প্রহরীকে মাথায় কাষ্ঠখন্ড দিয়ে আঘাত করতে হুকুম করলেন। আঘাত করাতে কিছুটা যেন আরাম বোধ হলো মনে করলেন। সুতরাং এই উপায়েই রোগের চিকিৎসা চলতে লাগলো। যতক্ষণ আঘাত করা যায় ততক্ষণ মশাটা চুপ করে থাকে—আঘাত বন্ধ হলে মশাটা কামড়াতে শুরু করে।

এই ভাবে দিন কাটতে লাগলো। আহার নেই—শয়ন নেই—নিদ্রা নেই—অবিরাম আঘাত চলতে থাকলো।

এই ঘটনার চল্লিশ দিন পরে ইব্রাহিম একদিন এসে নমরূদকে বললেন ঃ শাহানশাহ নমরূদ, আপনি করুণাময় খোদার নিকটে আপনার কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি পরম দয়ালু—আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। আপনি এই দারুণ যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবেন।

নমরূদ ইব্রাহিমের কথা গ্রাহ্য মাত্র করলেন না। বললেন ঃ চল্লিশ দিন তো সামান্য–যতদিন জীবন আছে ততদিন যদি এমনি কষ্ট ভোগ করি তথাপি তোর খোদার কাছে ক্ষমা চাইবো না–তোর খোদাকে মানবো না।

ইব্রাহিম বললেন ঃ আপনি খোদাকে মানেন না বটে, কিন্তু আপনার ঘরবাড়ি আসবাবপত্র যা আপনি দেখছেন সকলেই তাঁর বন্দনা করে।

নমরূদ অত্যন্ত সবলকণ্ঠে বললেন ঃ কখনো নয়।

ইব্রাহিম বললেন ঃ শুনুন তবে।

তন্মুহূর্তে প্রাসাদের চারদিক থেকে শব্দ হতে লাগলো ঃ 'খোদা এক এবং অদ্বিতীয়, ইব্রাহিম তাঁর বন্ধু'।

নমরূদ বললেন ঃ ইব্রাহিম তুমি যাদু জানো।

ইব্রাহিম জবাব দিলেন ঃ সকল যাদুর যিনি অধিপতি এসব তাঁর দ্বারাই সম্ভব। নমরূদ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে আদেশ করলেন ঃ এই প্রাসাদ, এই আসবাবপত্র–এই ব্যাবিলন পুড়িয়ে দাও।

প্রহরীরা ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিন্তু নমরূদ পুনরায় গর্জন করে উঠতে তারা শহরের চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিলো। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করলো।

নমরূদ নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বল অগ্নির দিকে চেয়ে রইলেন।

ইব্রাহিম বললেন ঃ ব্যাবিলন পুড়ে গেল বটে, কিন্তু আপনার গায়ের জামা-কাপড় আপনার হাত-পা সবাই তো খোদাকে মানে।

নমরূদ শুনতে পেলেন, সত্যই তাঁর দেহের বস্ত্রখন্ড হতে–পদযুগল হতে শব্দ উত্থিত হচ্ছে ঃ 'খোদা এক এবং অদ্বিতীয়, ইব্রাহিম তাঁর বন্ধু।'

নমরূদ জামা খুলে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিলেন। কোষ থেকে তরবারি মুক্ত করে আঘাত করতেই দেহ থেকে পা-দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে লাফাতে লাগলো। তবু পাপাচারী নমরূদের মুখে খোদার নাম উচ্চারিত হলো না।

ইব্রাহিম অনুরোধ করলেন ঃ এখনো আপনি খোদার স্মরণ নিন্ তিনি আপনাকে শান্তি দিবেন।

নমরূদের জিদ অত্যন্ত প্রবল। বিকৃত কণ্ঠে বললেন ঃ ও-সব বুজরুকি আমার কাছে চলবে না।

কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্যের দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। তাঁর দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান বাতাসে মিশে গেলো।

বিবি হাজেরা কাঁদে দূর মরু ময়দানে,
ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ তাঁরে ত্যাজে কোন্ প্রাণে।
সারা ও হাজেরা বিবি সতীন দুইজন,
হাজেরাকে ইব্রাহিম দেন নির্বাসন;
মরু আরবের ময়দানে একা কাঁদিছে হায়!
কোলে শিশু কাঁদে—এক ফোঁটা পানি দাও তায়!
ধূ ধূ বালু—পানি হায় নাহি কোন খানে।
'পানি কোথা পানি দাও' পানি বলি ফুকারে নারী;
পিপাসায় প্রাণ বাহিরায়—কোথায় বারী।
দেহ পুড়ে যায় সাহারার 'লু' হাওয়ায়
আগুন ঢালিছে রোদ প্রাণ বুঝি যায়—
থৈ-থৈ জ্বলে বালু—বালুর সাগর,
মরীচিকা মনে হয় ওই সরোবর,
অভাগী ছুটিয়া যায় পানির সন্ধানে।
নয়নে অশ্রু নাই—দেহ ফেটে লহু বুঝি ঝরে,
এক ফোঁটা পানি দাও—কলিজা বিদরে!
শিশু ইসমাইল পড়ে মাটিতে লুটায়
হাত পা ছুঁড়িয়া শিশু খেলা করে তায়,
পায়ের আঘাতে তার জমিন ফাটিয়া
পানির ঝরণা-ধারা আসে বাহিরিয়া,
হাজেরা শোকর করে খোদা মেহেরবানি।
হাজেরা বিবি সেই 'আবে জম্ জম্' পান করে প্রাণ বাঁচালেন।

হাজেরার নির্ব্বাসন

হযরত ইব্রাহিম একবার ভ্রমণ করতে বেরিয়ে নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে হারাম দেশে এসে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে কিছুদিন বাস করার পরে সারা খাতুনকে বিবাহ করবার তার সুযোগ ঘটে। আরো কিছুকাল সেখানে কাটিয়ে তিনি মিশর রাজ্যে গিয়ে সেখানকার সুলতানের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সম্রাট তাঁর সৌজন্য ও সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে অতিশয় আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁর ধর্মালোচনায় মুগ্ধ হয়ে একান্ত অনুগত হয়ে পড়লেন! কিছুকাল থাকবার পর ইব্রাহিম মিশর ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে সম্রাট তাকে বহু ধনরত্ন পারিতোষিক প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে একটি পবিত্র-চরিত্রা বাঁদীও তাকে উপহার দেন। সেই বাঁদীটির নাম হাজেরা। হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে নানা দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে অবশেষে তিনি প্যালেস্টাইন এসে উপনীত হলেন।

সারা খাতুনের কোন সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করলো না। প্রতিবেশীরা মনে ভাবলেন, তিনি বন্ধ্যা। হযরত ইব্রাহিম পুত্রমুখ দেখতে না পেয়ে মনের কষ্টে দিন কাটান। তাঁকে সর্বদা অতিশয় ম্লান দেখাতো। স্বামীর দুঃখ বুঝতে পেরে সারা খাতুন চিন্তা করলেন, তাঁর নিজের গর্ভে তো সন্তানাদি হলো না। হাজেরার সাথে স্বামীর বিবাহ দিলে হয়তো সকলের মনষ্কামনা পূর্ণ হতে পারে।

কথাটা তিনি একদিন প্রসঙ্গক্রমে স্বামীর নিকটে ব্যক্ত করলেন। হযরত ইব্রাহিম অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। অনেক দ্বিধার পর তিনি সারা খাতুনকে খুশী করবার অভিপ্রায়ে অবশেষে স্বীকৃত হলেন। এক শুভক্ষণে ইব্রাহিম বিবি হাজেরার পাণি গ্রহণ করলেন এবং সন্তান কামনা করে খোদাতা'লার অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন।

ভক্তের প্রার্থনা কখনো বিফলে যায় না। খোদাতা'লা তাঁর আরজ মঞ্জুর করলেন। যথাসময়ে ইব্রাহিমের একটি চাঁদের মতো শিশু জন্মগ্রহণ করলো। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্নপুরী আনন্দে মশগুল হয়ে উঠলো। শিশুটির নাম রাখা হইল ইসমাইল।

নারীর মন অতি বিচিত্র। যে সন্তানের জন্য সারা খাতুন স্বেচ্ছায় সপত্নী গ্রহণ করলেন চাঁদের মতো সেই সন্তানকে দেখে তাঁর মনে হিংসার উদ্রেক হলো। ক্রমে এমন অবস্থা হলো যে, সতীনের পুত্রকে কিছুতেই তিনি আর বরদাশত করতে পারলেন না। এক বাড়িতে নিজের চোখের সম্মুখে সপত্নীপুত্রকে সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো। তিনি হযরত ইব্রাহিমকে সর্বদা বিবি হাজেরার দুর্নাম শোনাতে লাগলেন এবং তাদের পরিত্যাগ করবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু ইব্রাহিম তাঁর অন্যায় আবদার রক্ষা করলেন না।

কিন্তু ভাগ্য যাদের অপ্রসন্ন দুঃখ তাদের সইতেই হয়! শেষ অবধি হাজেরাও খোদার রোষ থেকে রক্ষা পেলেন না। আল্লাহতা'লা ইব্রাহিমকে হাজেরা ও তাঁর পুত্রকে নির্বাসিত করবার জন্য আদেশ করলেন। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে পত্নী এবং পুত্রকে মক্কা নগরীর নিকটে এক মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন, তার পর অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে হাজেরাকে বললেন ঃ খোদার হুকুমে তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এই বলে তিনি এক মশক পানি ও কিছু খেজুর তাঁকে দিয়ে চলে গেলেন। কিছু দূরে গিয়ে প্রার্থনা করলেন ঃ হে খোদা, তোমারই হুকুমে আমার স্ত্রী ও পুত্রকে এস্থানে রেখে যাচ্ছি। তুমি সকলের রক্ষাকর্তা প্রভু, এরা যেন কোন বিপদে না পড়ে–তুমিই এদের রক্ষা করো।

কিছুদিন পরে খাদ্য এবং পানীয় নিঃশেষ হয়ে গেলো। জননীর বুকের দুধের ধারাও ক্ষীণ হয়ে এলো। শিশু ইসমাইল ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় চিৎকার করতে লাগলো। হাজেরা নিকটবর্তী পাহাড়ের ওপরে উঠে জলাশয়ের সন্ধান করতে লাগলেন। নিরাশ হয়ে অপর একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে নিকটে কোনো জনমানবের বসতি আছে কিনা লক্ষ্য করতে লাগলেন এবং মনে মনে খোদার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে লাগলেন। বারে বারে নিরাশ হয়েও বেচারী হাজেরা একবার সম্মুখে ও একবার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির সন্ধান তিনি পেলেন না।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে পাথরের টুকরা সরে গিয়ে একটা গর্ত হয়েছে ও তার মধ্যে থেকে ক্ষীণ পানির ধারা ধীরে ধীরে বের হচ্ছে। তিনি পরম দয়াবান খোদাতা'লাকে অন্তরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রাণভরে পানি পান করলেন এবং শিশুর মুখে দিলেন।

ঝরণার চারিধারে বিবি হাজেরা বাঁধ দিয়ে দিলেন, ফলে সেটা একটা সুমিষ্ট পানীয় কূপ তৈরি হলো। ঐ কূপ চার হাজার বৎসর ধরে লোককে পানীয় জুগিয়ে আজও হযরত হাজেরার মাতৃহৃদয়ের আকুল প্রার্থনার সাক্ষ্য দান করছে। ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে লোকের বসতি হয়ে সুবিখ্যাত মক্কা নগরী তৈরি হয়েছে।

সেই সময়ে সদোম নগরীর লোকেরা খোদাতা'লার বিধিনিষেধ না মেনে নানা রকম কুৎসিৎ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। হযরত লুত তাদের সৎপথে আনবার এবং ধর্মপথে চালাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। লুতের সদুপদেশ তাদের একেবারেই ভাল লাগে না।

খোদাতা'লা কয়েকজন ফেরেশ্‌তাকে সদোম নগরী ধ্বংস করবার জন্যে প্রেরণ করলেন।

ফেরেশ্‌তারা প্রথমে হযরত ইব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হলেন। ইব্রাহিম তাদের যথোচিত সমাদরের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু ফেরেশ্‌তারা কিছুই আহার করলেন না, কারণ তাঁরা সমস্ত আহার বিহারের অতীত। ইব্রাহিম ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা নিজেদের পরিচয় প্রদান করে [illegible] ঃ সদোম নগরী ধ্বংস করবার জন্য খোদাতা'লা কর্তৃক তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। কারণ নগরের লোকেরা নানারূপ পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। ফেরেশ্‌তারা সারা খাতুনকে বললেন যে, শীঘ্রই তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে ইসহাক এবং সেই পুত্রের পুত্র হলে তাঁর নাম হবে ইয়াকুব।

কিন্তু সারা খাতুন তাঁদের কথায় সন্দিহান হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এই বৃদ্ধ বয়সে কি করে তার পুত্র হওয়া সম্ভব।

ফেরেশ্‌তারা বললেন ঃ খোদাতা'লার কৃপায় সকলই সম্ভব।

হযরত ইব্রাহিম সদোম নগরীর ধ্বংস অনিবার্য জেনে পাপী লোকদের জন্য খোদাতা'লার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু খোদাতা'লা তাঁকে জানালেন যে, সদোম নগরীর ধ্বংস কিছুতেই নিবারিত হবে না।

ফেরেশ্‌তারা হযরত লুতের নিকটেও অতিথির ছদ্মবেশে উপস্থিত হলেন এবং তাকেও সদোম নগরীর ধ্বংস সম্পর্কে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন ঃ

তুমি অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে অদ্য রাত্রেই এ-স্থান পরিত্যাগ করো। নইলে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। কারণ খোদাতা'লার রোষ শীঘ্রই এই লোকদের ওপরে পতিত হবে, এমন কি তোমার স্ত্রীও সে গজব থেকে রক্ষা পাবে না।

হযরত লুত সেই রাত্রেই সদোম নগরী পরিত্যাগ করলেন। রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্পে সেই বিশাল নগরীর বিপুল ঐশ্বর্য, অতুল দম্ভ এবং অগণিত নরনারীসহ চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বক্ষ বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

ইব্রাহিম খলিলুল্লা খোদাতা'লার প্রিয়জন
কোরবানি দেন ইসমাইলে তার সন্তান আপন।
এক রাত্রে তিনি খোয়াব দেখলেন
খোদা যেন তাকে হুকুম করেছেন,
'ইয়া ইব্রাহিম কোরবানি দে কোরবানি দে।'
(তিনি) তিনি ভোরে উঠে শত উট করলেন জবেহ।
ভাবলেন–খোদার আদেশ হলো সমাপন।
পরের রাতে স্বপন দেখেন হুকুম আল্লাহ্‌র
প্রাণের চেয়ে প্রিয় যাহা কোরবানি দিস তার।
প্রাণের চেয়ে প্রিয়! সে ত অপর কেহ নয়
পুত্র কেবল ইসমাইল জবিউল্লাহ হয়।
ইসমাইলে সঙ্গে নিয়ে ময়দানেতে যান
তাঁরে তিনি বধ করবেন একথা জানান,
শহীদ হবে শুনে পুত্র অতি খুশী হন।
ছুরি হাতে ইব্রাহিম বেঁধে নিলেন আঁখি,
হয়তো মমতা হবে (খোদার কাজে) আসতে পারে ফাঁকি।
চোখ বেঁধে তাই ছুরি চালান পুত্রের গলায়
দেহ হতে মাথা কেটে ভূমিতে লুটায়।
চোখ খুলে চেয়ে দেখেন পুত্র বেঁচে আছে
তার বদলে (এক) দুম্বা জবেহ করিয়াছে;
ঈমান পরীক্ষা হলো–ধন্য হলো সে পাক জীবন।
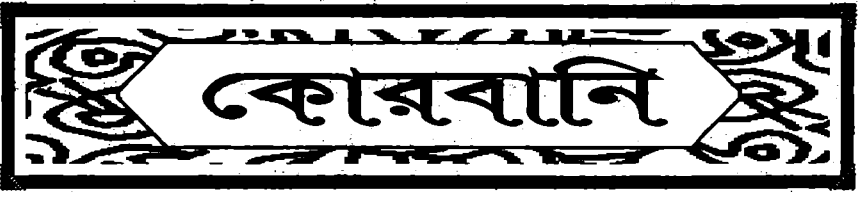
কোরবানি

হযরত ইব্রাহিম বিবি হাজেরাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি সারা খাতুনের অনুমতি গ্রহণ করে মক্কা নগরীতে মাঝে মাঝে এসে স্ত্রী ও পুত্র ইসমাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতেন।

একদিন ইব্রাহিম স্বপ্নে দেখতে পেলেন, খোদাতা'লা যেন তাকে কোরবানি করবার জন্যে হুকুম করছেন। পরদিন আল্লাহের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি একশত উট ও দুম্বা কোরবানি করলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সেদিন রাত্রে তিনি পুনরায় খোদাতা'লার আদেশ পেলেন যে, তাঁকে পুনরায় কোরবানি করতে হবে। তিনি সে হুকুমও পালন করলেন। কিন্তু অতিশয় তাজ্জবের কথা তাঁর সে কোরবানি গ্রহণ করলেন না। পরের রাত্রে তিনি পুনরায় খোয়াব দেখলেন, খোদা তাঁকে যেন হুকুম করেছেন ঃ ইব্রাহিম, তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আমার উদ্দেশ্যে কোরবানি করো।

ইব্রাহিম বিষম বিপদে পতিত হলেন। সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কি? ধন-ঐশ্বর্য বিষয় সম্পত্তি–এ সকল তো প্রিয়। স্ত্রী এদের চেয়ে প্রিয়। স্ত্রী অপেক্ষা আপনার প্রাণ অধিক প্রিয়। জগতে সকলের চেয়ে প্রিয়তম তাঁর পুত্র। নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হলো। তিনি ভাবলেন, খোদাতা'লা সম্ভবতঃ তাঁর পুত্রকেই কোরবানিরূপে চাইছেন। উত্তম, তাই হবে। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। অনেক পুণ্যে ইব্রাহিমকে এই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। খোদার অনুগ্রহ থাকলে নিশ্চয়ই এই হৃদয়-দ্বন্দ্ব এবং ঈমান পরীক্ষায় তিনি জয়ী হতে পারবেন। সঙ্কল্প স্থির করে হযরত ইব্রাহিম পুত্রকে

সঙ্গে নিয়ে দূরবর্তী পাহাড়ের নিকটে গেলেন এবং ইসমাইলকে খোদার আদেশ জ্ঞাপন করলেন। ইসমাইল পিতার কথা শুনে আপনার জীবন বলি দিতে সানন্দে স্বীকৃত হলেন। বললেন ঃ আব্বা খোদা আমায় জীবন দিয়েছেন, তিনিই যখন গ্রহণ করতে চাচ্ছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি যথা-সম্ভব শীঘ্র কোরবানি করুন।

ইব্রাহিম মনকে দৃঢ় করে বস্ত্রের মধ্য থেকে ছুরিকা বের করলেন। তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র প্রথম রৌদ্রে ঝলসে উঠলো। একখানা রুমাল দিয়ে তিনি পুত্রের চোখ বেঁধে দিলেন এবং জবেহ্ করতে মনে মমতার সঞ্চার হতে পারে ভেবে অপর একখানি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আপনার চক্ষু আবৃত করলেন। দৃঢ়হস্তে ইসমাইলের গলায় ছুরিকা চালালেন।

কার্য সমাপ্ত করে চোখের বন্ধন তিনি মুক্ত করলেন। কী আশ্চর্য, খোদার এমনি মর্তবা পুত্র ইসমাইল অক্ষত দেহে সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার পরিবর্তে একটি দুম্বা জবেহ্ হয়ে ভূমিতলে পড়ে আছে।

এমন সময় গায়েবী আওয়াজ (দৈববাণী) শুনতে পাওয়া গেলো ঃ ইব্রাহিম তোমার কোরবানি আল্লাহ্ কবুল করেছেন। পুত্রকে জবেহ্ করবার আর প্রয়োজন নাই।

পিতা ও পুত্রের হৃদয় খোদার অসীম করুণার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে গেল।

কাবা গৃহের প্রতিষ্ঠা

পূর্বে খোদাতা'লার এবাদতের জন্য কোন মসজিদ বা গৃহ নির্দিষ্ট ছিলো না। খোদার আদেশে হযরত ইব্রাহিম সর্বপ্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপাসনা গৃহ নির্মাণ শুধু তিনি ও তাঁহার পুত্র ইসমাইল দু'জনে করেছেন। হযরত ইসমাইল পাথর তুলে দিতেন ও হযরত ইব্রাহিম সেই পাথর দ্বারা দেওয়াল গাঁথতেন। এইরূপে পিতাপুত্রে কাবা ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করেন। কিন্তু ইহার ছাদ নির্মাণ তিনি করেননি।

কাবা নির্মাণ করতে বহুদিন সময় লেগেছিলো। এত বেশি দিন লেগেছিলো যে, হযরত ইব্রাহিম যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করতেন, তার ওপরে তাঁর পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে। আজও পর্যন্ত পাথরখানি আছে। হাজিগণ কাবা প্রদক্ষিণের পূর্বে ঐ স্থানে নামাজ পড়ে থাকেন। এর নাম মকামে ইব্রাহিম।

কাবাগৃহ নির্মাণ শেষ হলে হযরত ইব্রাহিম প্রার্থনা করেছিলেন ঃ হে পরোয়ারদিগার (পালনকর্তা) আমরা পিতাপুত্রে পরিশ্রম করে যে গৃহ নির্মাণ করলুম, হে প্রভু, তুমি তা গ্রহণ করো। হে সর্বশক্তিমান, আমরা ও আমাদের বংশধরেরা যেন তোমার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারি। আমাদের বংশধরগণের জন্য তাদের মধ্য থেকেই তুমি এমন মহামানব পাঠাও যাঁরা তোমার বাণী সকলকে শোনাবেন।

আল্লাহতা'লা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। তিনি পুনরায় প্রার্থনা করেছিলেন ঃ হে প্রভু এই স্থানে শান্তি দাও ও সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করো। হে দয়াময়, আমি তোমার এই পবিত্র গৃহের নিকটে আমাদের বংশধরগণের জন্য বাসস্থান মনোনীত করলুম। এ স্থান যেন শস্যশ্যামল হয়ে উঠে। শেষ বিচারের দিনে তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, আমার বংশধরগণকে এবং তোমাকে যাঁরা বিশ্বাসী তাদের সবাইকে ক্ষমা করিও।

বৃদ্ধ বয়সে বিবি সারা খাতুনের গর্ভে হযরত ইব্রাহিমের এক পুত্র সন্তান জন্মে। তাঁহার নাম ইসরাইল (আঃ)। ইসরাইলের দুই পুত্র ইয়াশা ও ইয়াকুব। ইয়াকুবের বারোটি পুত্র, তন্মধ্যে একাদশ পুত্র হযরত ইউসুফ। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বনি-ইয়ামিন।

হযরত ইয়াকুব জানতেন যে, ইউসুফ ভবিষ্যৎ জীবনে নবী হবেন। তিনি অতি গুণবান, শ্রী ও লাবণ্যমন্ডিত ছিলেন। শৈশবেই ইউসুফ ও বনি ইয়ামিন মাতৃহীন হন। নানা কারণে হযরত ইয়াকুব অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা ইউসুফকে একটু বেশি আদর যত্ন করতেন। এই জন্য বিমাতার গর্ভে অপর দশজন ভ্রাতা ইউসুফকে একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখতেন।

ইউসুফ একদা রাত্রে স্বপ্ন দেখতে পেলেন–সূর্য চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র তাঁকে যেন অভিবাদন করছে। পরদিন পিতার নিকটে কথাটা বললেন। ইয়াকুব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ তোমার পিতামাতা ও এগারটি ভাইয়ের চাইতে তুমি শ্রেষ্ঠ হবে। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার অপর ভ্রাতাদের নিকটে এ বিষয়ে কিছু বলো না। কারণ তা' হলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে।

পিতার মনে আশঙ্কা ছিলো একে তো ভাইরা ইউসুফকে হিংসার চোখে দেখে তার ওপরে তারা কোনো গতিকে স্বপ্নের কথা জানতে পেরে হয়তো আরো হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু সাবধানতা সত্বেও ভ্রাতারা স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানতে পারলো। তারা পরামর্শ করতে লাগলো, কিরূপে ইউসুফকে তাদের মধ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। অনেক যুক্তিতর্কের

পর তারা স্থির করলো তাঁকে না মেরে কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। যদি ভাগ্যে থাকে কোন পথিকের দয়ায় তাঁর প্রাণরক্ষা হলেও হতে পারে।

এইরূপ পরামর্শ করে তারা পিতার নিকটে গিয়ে বললেন ঃ আব্বা, ইউসুফ তো এখন বড়োসড়ো হয়েছে, ওকে আর বাড়িতে রাতদিন না রেখে আমাদের সঙ্গে মাঠে পাঠিয়ে দিন। সেখানে সে খেলাধুলা করবে। আমরা তাকে দেখাশুনা করবো।

হযরত ইয়াকুব প্রথমে তাদের কথায় রাজি হলেন না। কিন্তু তাদের পীড়াপীড়ি ও অনেক তর্কের পর অবশেষে তাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন।

পরের দিন তারা ইউসুফকে অনেক দূরে এক নির্জন মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার দেহ থেকে জামা কাপড় খুলে নিয়ে তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করলো। ইউসুফ প্রায় মরে যাবার মতো হলেন। তাদের সবচেয়ে বড় ভাই বললো ঃ তোমরা ওকে মেরে ফেলো না। ওকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দাও।

তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে তারা কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে গেলো।

বাড়ি এসে পিতার নিকটে তারা কপট দুঃখ প্রকাশ করতে করতে জানালো ঃ আব্বা ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে। এই দেখুন তার জামায় রক্ত।

হযরত ইয়াকুব আর কি করেন। তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কয়েকদিন পরে একদল সওদাগর সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মরুভূমির পথে সঙ্গে পানীয় প্রায় নিঃশেষ হওয়ায় কূপ থেকে পানি সংগ্রহের ইচ্ছা করে তাঁরা বালতি নামিয়ে দিলেন। সেই সময়ে খোদার আদেশে ইউসুফ তাঁদের বালতির মধ্যে উঠে এলেন। ওদিকে তাঁর দশ ভাই তখন সেখানে ভেড়া চরাচ্ছিল। তারা ইউসুফকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বললো ঃ কি আশ্চর্য, এ যে আমাদের সেই গোলাম—কয়েক দিন থেকে পালিয়ে এসেছে। একে যদি আপনারা ক্রয় করেন তবে আমরা বিক্রি করতে পারি।

প্রতিবাদ করলে ভ্রাতারা পাছে তাঁকে বধ করে এই ভয়ে ইউসুফ চুপ করে রইলেন।

কয়েকটি টাকা দিয়ে সওদাগরেরা তাঁকে কিনে নিলেন। সওদাগরের সঙ্গে ইউসুফ মিশর দেশে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তাঁকে তাঁরা বাদশাহের এক আত্মীয় কিৎফীর আজিজ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বিক্রয় করলেন। আজিজ ইউসুফকে তাঁর স্ত্রী জুলেখার খাস গোলাম করে দিলেন।

ইউসুফ বয়ঃপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অসামান্য রূপবান হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর অপরূপ শ্রী, লাবণ্য ও সুগঠিত দেহ সৌষ্ঠবের প্রতি প্রভু-পত্নী জুলেখা দিন দিন আকৃষ্ট হতে লাগলেন। একদিন তিনি তাঁর প্রতি অনুগত হবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ইউসুফ সে কথায় একেবারে কর্ণপাত মাত্র করলেন না। জুলেখা নানা প্রকার প্রলোভন দিয়েও তার মন জয় করতে পারলেন না। অবশেষে নিরাশ হয়ে তিনি তাঁর স্বামীর নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন।

ইউসুফ দোষারোপের প্রতিবাদ করে বললেন ঃ এই নারীই আমাকে অন্যায় কার্যে লিপ্ত করবার চেষ্টা করেছে।

এইরূপে একে অন্যের নামে দোষ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইউসুফ ও জুলেখার এই সকল কাহিনী ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়লো। অন্যান্য রমণীরা ছি ছি করতে লাগলো। তারা জুলেখার দোষ দিতে লাগলো।

জুলেখা যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে অপরাপর মহিলারা অন্যায় আলোচনা আরম্ভ করেছে, তখন তিনি তাদের জব্দ করার জন্য ফন্দী আঁটলেন। তিনি একদিন তাদের নিমন্ত্রণ করলেন এবং ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয় এমন একটি খাবার প্রস্তুত করলেন। সকলে খেতে এলে তাদের প্রত্যেককে এক একটি ছুরি দিলেন। তারা যখন খেতে আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়ে জুলেখা ইউসুফকে ডাকলেন। ইউসুফকে দেখে মেয়েরা এত বিস্মিত ও মুগ্ধ হলো যে তারা খাবার কাটতে গিয়ে নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেললো। তারা বলাবলি করতে লাগলো ঃ এত রূপ! এত সুন্দর! এ কি মানুষ না ফেরেশ্‌তা।

জুলেখা সেই সময়ে সুযোগ পেয়ে বললেন ঃ তোমরা আমাকে দোষী করছিলে–এবার তো তোমরাও দোষী।

নিমন্ত্রিত মহিলারা এবারে সত্য সত্যই লজ্জিত হলো।

ইউসুফের প্রতি নারীদের এইরূপ আসক্তির কথা জানতে পেরে সমাজের মাতব্বরেরা শঙ্কিত হলেন। তাঁরা নৈতিক জীবন পবিত্র রাখার জন্য ইউসুফের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন। বাদশাহ উপায়ান্তর না পেয়ে নিরপরাধ ইউসুফের কারাবাসের হুকুম দিলেন।

ইউসুফকে কয়েদখানায় নেওয়া হলো। তাঁর সঙ্গে আরো দু'টি যুবককেও কারাগারে প্রেরণ করা হলো।

একদা রাত্রে সেই যুবক দু'টি স্বপ্ন দেখলো। সেই স্বপ্নের কথা ইউসুফকে জানালো। একজন বললো, সে যেন আঙ্গুর থেকে রস বের করছে।

অপর একজন বললো, সে যেন মাথায় বয়ে রুটি নিয়ে যাচ্ছে! কতকগুলি পাখি সেই রুটিগুলো ঠুকরে খাচ্ছে।

ইউসুফ খোদাতা'লার কৃপায় প্রগাঢ় তত্ত্বদর্শী হয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করে বললেন ঃ দেখ, তোমাদের একজন শীঘ্রই মুক্তি পাবে এবং বাদশাহের সঙ্গী নিযুক্ত হয়ে তাঁকে সরবত পান করাবে। অপরজনের ফাঁসী হবে এবং তার মাথা পাখিতে ঠুকরে খাবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ইউসুফের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই ফলে গেলো। একজন মুক্তি পেলো অপরজনের ফাঁসী হলো। যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিলো সে বাদশাহের অনুচর নিযুক্ত হলো।

কিছুদিন পরে বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখলেন, সাতটি কৃশকায় গাভী সাতটি বলবতী গাভীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি শীর্ণ ধানের শীষ সাতটি সতেজ ধানের শীষকে খেয়ে ফেলছে। বাদশাহ পরদিন দরবারে স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করে অনুচরদের কাছে এর অর্থ জানতে চাইলেন। কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে পারলো না। কারাগারের সেই যুবক সেখানে উপস্থিত ছিলো। ইউসুফের কথা তার মনে পড়ে গেলো তখনই তাঁর কাছে গিয়ে সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। ইউসুফ বললেন ঃ প্রথমে সাত বৎসর খুব ভাল ফসল হবে। তোমরা তা থেকে যতটা পার সঞ্চয় করবে। তারপর সাত বৎসর ভীষণ অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হবে সে সময় তোমরা সেই সঞ্চিত শস্য থেকে খরচ করতে পারবে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পেরে বাদশাহ খুব সন্তুষ্ট এবং ইউসুফকে তাঁর নিকটে আনবার সঙ্কল্প করলেন।

যে সকল মেয়ে অসাবধানতায় নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিলো, তাদের কাছে অনুসন্ধান করে বাদশাহ জানতে পারলেন ইউসুফ তাদের সংগে কোনো অসদ্ব্যবহার

করেননি। তারাই ইউসুফকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলো। জুলেখাও সেখানে ছিলেন। তিনি এ কথার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেন।

বাদশাহ্ সব কথা শুনে অনুতপ্ত হলেন এবং ইউসুফকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন।

ইউসুফের স্বপ্নের ব্যাখ্যা সত্য সত্যই সফল হলো। প্রথম সাত বৎসর ভাল ফসল হলো এবং পরের সাত বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো।

মিশরের সঞ্চিত খাদ্যের কথা জানতে পেরে নানা দেশ থেকে লোকজন আসতে লাগলো। ইউসুফের ভ্রাতারাও খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে এলো। তিনি তাদের দেখে চিনতে পারলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারলো না। তিনি ভ্রাতাদের খাদ্য দিয়ে বলে দিলেন ঃ আবার যখন আসবে তোমাদের ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসো। তাকে না নিয়ে এলে খাদ্য পাবে না। এই বলে অনুচরবর্গের দ্বারা কিছু অর্থ গোপনে খাদ্যের থলির মধ্যে পুরে দিলেন।

তারা বাড়ি গিয়ে তাদের পিতাকে মিশরের শাসনকর্তার অনেক গুণের কথা বর্ণনা করলো এবং এবারে ছোট ভাইকে নিয়ে যাবার জন্য বলে দিয়েছেন সে কথাও জানালো। হযরত ইয়াকুব তাদের পূর্বের কাজ স্মরণ করে কনিষ্ঠ পুত্র বনি ইয়ামিনকে তাদের সঙ্গে দিতে রাজি হলেন না।

খাদ্যের বস্তা খোলা হবার পর তার মধ্যে টাকা দেখতে পেয়ে তারা খুবই বিস্মিত হলো।

পুনরায় খাদ্যাভাব ঘটলে তারা তাদের পিতাকে গিয়ে শক্ত করে ধরে বললো ঃ আব্বা, আপনি ছোট ভাইকে আমাদের সংগে যেতে দিন। খোদার নামে শপথ করে বলছি, আমরা তাকে অক্ষত দেহে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

পিতা তাদের জিদের কাছে পরাজিত হয়ে অগত্যা অনুমতি দিলেন। বনি-ইয়ামিনকে সংগে নিয়ে তারা গেলো এবং ইউসুফের নির্দেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করলো। ইউসুফের কাছে যখন তারা পৌছলো তখন ছোট ভাইকে ডেকে নিয়ে তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করলেন।

অন্যবারের মতন এবারেও তাদের বস্তা বোঝাই করে খাদ্য দেওয়া হলো। ইউসুফের এক চাকর একটি পেয়ালা ইচ্ছা করে ছোট ভাইয়ের বস্তায় লুকিয়ে রেখে দিলো।

পেয়ালা হারিয়ে যাওয়ায় বিশেষ সোরগোল পড়ে গেলো। অবশেষে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর বনি-ইয়ামিনের বস্তার মধ্যে সেটা পাওয়া গেলো।

বনি-ইয়ামিনকে বাদশাহের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। তার ভ্রাতারা বললেন ঃ আমাদের পিতা খুব বৃদ্ধ হয়েছেন। এটি তার সকলের ছোট ছেলে। একে ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে পিতা বড়ই কষ্ট পাবেন। আপনি এর বদলে আমাদের একজনকে রাখুন!

ইউসুফ বললেন ঃ তা হতে পারে না।

সকলের বড় ভাই অন্যান্য সকলকে বললো ঃ তোমরা ফিরে যাও, আমি আল্লাহ্র নাম শপথ করে পিতাকে বলে একে নিয়ে এসেছি। কোন মুখে পিতার কাছে ফিরে যাবো। আমি বনি-ইয়ামিনের সঙ্গে এখানেই থাকবো!

তারা দেশে গিয়ে হযরত ইয়াকুবকে সমস্ত সংবাদ জানালো। তিনি শুনে দুঃসহ শোকে আর্তনাদ করতে লাগলেন। শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে বললেন ঃ দেখ আল্লাহ্র দয়ায় আমি অনেক কিছু জানি। তোমরা আল্লাহ্র ওপরে বিশ্বাস রেখে ইউসুফ ও বনি ইয়ামিনের খোঁজ করো।

পিতার আদেশে তারা পুনরায় মিশরে গেলো এবং খাদ্য কিনতে চাইলো। সেই সময় ইউসুফ তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রদান করলেন। বললেন ঃ আল্লাহ্তা'লা তোমাদের ক্ষমা করবেন, তিনি ক্ষমাশীল। তোমরা আমার এই জামা পিতার কাছে নিয়ে যাও, তাহলে তিনি জানতে পারবেন।

আল্লাহ্র কৃপায় ইয়াকুব সব জানতে পারলেন। ইউসুফের ভাইরা এসে তার জামা পিতাকে দিলেন। হযরত ইয়াকুব খুশী হয়ে বললেন ঃ পূর্বেই বলেছি, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

ইউসুফের পরামর্শ মতো তাঁর ভ্রাতারা তাদের পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে মিশরে গেলেন। সেখানে ইউসুফ তাঁদের বসবাস করবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অনেকদিন আগের কথা। আরব দেশে সাদ নামে একটি বংশ ছিলো। এই বংশের লোকদের চেহারা ছিলো যেমন খুব লম্বা এবং চওড়া, গায়েও তেমনি ভীষণ শক্তি।

তারাই ছিলো তখন আরব দেশে প্রবল এবং প্রধান।

তাদের একজন বাদশাহ ছিলো–তার নাম শাদ্দাদ। শাদ্দাদ ছিলো সাত মুলুকের বাদশাহ্। তার ধন-দৌলতের সীমা ছিলো না। হাজার হাজার সিন্দুকে ভরা মণি, মুক্তা, হীরা জহরৎ। পিলপানায় লক্ষ লক্ষ হাতী, আস্তাবলে অসংখ্য ঘোড়া। সিপাই-শাস্ত্রী যে কত তার লেখাজোকা ছিলো না। উজীর-নাজীর পাত্র-মিত্র, আমলা-গোমস্তায় তার রঙমহল দিনরাত গম্-গম্ করতো।

সাধারণতঃ মানুষের ধনদৌলত যদি একটু বেশি থেকে থাকে তবে সে একটু অহঙ্কারী হয়ই। শাদ্দাদ বাদশাহের দেমাগ এত বেশি হয়েছিল যে, একদিন সে দরবারে বসে উজীর-নাজীরদের ডেকে সিংহের মতো হুঙ্কার দিয়ে বললো ঃ দেখ, আমার যে রকম শক্তি সামর্থ্য আর খুবসুরৎ চেহারা, তাতে আমি কি খোদা হবার উপযুক্ত নই?

উজীর-নাজীরেরা তাকে তোষামোদ করে বললো ঃ নিশ্চয়ই। এত যার ধন-দৌলত, লোক-লস্কর, উজীর-নাজীর, দালান-কোঠা, হাতী-ঘোড়া তিনি যদি খোদা না হন, তবে আর খোদা হবার উপযুক্ত এ দুনিয়ায় কে? এত সিন্দুক ভরা মণিমুক্তা, হীরা-জহরৎ এত হাতী-ঘোড়া আর দরবার ভরা আমাদের মতো উজীর-নাজীর খোদা তার চৌদ্দপুরুষেও দেখেনি। সুতরাং আপনিই আমাদের খোদা।

আরব দেশের লোকেরা সে সময়ে গাছ, পাথর প্রভৃতি পূজা করতো। শাদ্দাদ এটা মোটেই পছন্দ করতো না। সে হুকুম জারি করলো ঃ কেউ ইটপাথর বা অন্য মূর্তি পূজা করতে পারবে না, তার বদলে সম্রাট শাদ্দাদকে সকলের পূজা করতে হবে।

সাত মুলুকের বাদশাহ্ শাদ্দাদ, তার হুকুমের ওপরে কথা বলে এমন সাধ্য কারো নেই। সুতরাং তার হুকুম মতো কাজ চলতে লাগলো।

একদিন হুদ নামক একজন পয়গম্বর তার দরবারে এসে হাজির হলেন। পয়গম্বরেরা খোদার খুব প্রিয়। তাঁরা নবাব বাদশাহদের ভয় করতে যাবেন কেন। হুদ পয়গম্বর তাকে বললেন ঃ তুমি নাকি খোদার ওপর খোদকারী করার চেষ্টা করছো? তোমার এ দুঃসাহস কেন? পরকালের ভয় যদি থাকে তবে আল্লাহতা'লার উপরে ঈমান আনো।

হুদ নবীর দুঃসাহস দেখে দরবারের সকলে অবাক! উজীর-নাজীর, পাত্র-মিত্র যার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত–স্বয়ং বেগম সাহেবা যার কথার ওপরে কথা বলতে পারেন না, সামান্য একজন দরবেশ কিনা তাকে দিচ্ছে উপদেশ! এত বাচালতা! ক্রোধে শাদ্দাদের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। মেঘগর্জনের মতো হুঙ্কার দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ মূর্খ ফকির, তোমার খোদাকে মানতে যাবো কিসের জন্য?

হুদ নবী বললেন ঃ তিনি পরম মঙ্গলময়। তিনি দুনিয়াতে তোমাকে সুখে রাখবেন এবং মৃত্যুর পর তোমাকে বেহেশতে থাকতে দিবেন।

শাদ্দাদের ওষ্ঠে এইবার ক্রোধের পরিবর্তে হাসি ফুটে উঠলো। বললো ঃ তোমার খোদা কি আমার থেকেও বেশি সুখী।

হুদ হেসে জবাব দিলেন ঃ নিশ্চয়ই! খোদাতা'লা নেকবান্দার জন্য বেহেশ্ত তৈরি করেছেন। দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলে পরকালে বেহেশ্ত। বেহেশ্তের অতুলনীয় শোভা, অনন্ত শান্তি, অফুরন্ত সুখ, চাঁদের মতো খুবসুরৎ হুরী তো তুমি ভোগ করতে পারবে না।

শাদ্দাদ অবজ্ঞা ভরে হো-হো করে হেসে উঠলো। বললো ঃ রেখে দাও তোমার খোদার বেহেশ্তের কাহিনী। অমন আজগুবি গল্প ঢের ঢের শুনেছি।

হুদ বললেন ঃ আজগুবি নয়–সত্যি সত্যিই। খোদার এমন অপরূপ বেহেশ্ত কি তোমার পছন্দ হয় না?

শাদ্দাদ জবাব দিলো ঃ হবে না কেন—এমন আজব বেহেশ্‌ত কার অপছন্দ বলো? কিন্তু তাই বলে তোমার খোদার পায়ে আমি মাথা ঠুকতে যাবো কেন? আমি কি খোদার মতো বেহেশ্‌ত তৈরি করতে পারি না!

হুদ বললেন ঃ বাদশাহ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, নইলে এমন কথা বলতে না। খোদা যা করতে পারেন তা মানবের সাধ্যাতীত।

শাদ্দাদ সহাস্যে বললো ঃ মূর্খেরা এমন কল্পনাই করে বটে! কিন্তু আমি নিশ্চয়ই পারবো। তোমার খোদার চেয়ে আমার টাকা পয়সা লোক-লস্কর কিছু অভাব আছে নাকি? আমি দেখিয়ে দেবো, তোমার খোদার বেহেশ্‌ত থেকে আমার বেহেশ্‌ত কত বেশি সুন্দর।

শাদ্দাদের কথা শুনে হুদ ভয়ানক রেগে গেলেন। বললেন ঃ মূর্খ বাদশাহ, এত স্পর্ধা তোমার! শীঘ্রই দেখতে পাবে—এত অহঙ্কার কিছুতেই খোদা সহ্য করবেন না।

শাদ্দাদ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠলেন ঃ কে আছ, এই ভিখারীটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও।

হুদ নবী অপমানিত হয়ে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরের কথা।

বদখেয়ালী শাদ্দাদ তার তাঁবেদার বাদশাহদের ফরমান জারি করে জানালেন ঃ খোদার বেহেশ্‌তের চেয়ে বেশি সুন্দর করে অপর একটি বেহেশ্‌ত আমি সৃষ্টি করতে সঙ্কল্প করেছি। সুতরাং উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করো।

হুকুম মাত্র জায়গা তল্লাসের ধুম পড়ে গেলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আরব দেশের এয়মন স্থানটি সকলের পছন্দ হলো। স্থানটি লম্বায় আট হাজার মাইল আর চওড়ায় ছিলো পাঁচ হাজার মাইল।

বেহেশ্‌তের উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেছে শুনে শাদ্দাদ খুশি হলো। তারপর সে হুকুম জারি করলো যে সাত মুলুকে যে, সব হীরা, মণি, মুক্তা, জহরৎ আছে সব এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। বাদশাহের হুকুম কেউ অমান্য করতে সাহস করলো না।

দেখতে দেখতে দামী দামী হীরা, মণি, পান্না, জহরৎ এয়মন মুলুকে জমা হতে লাগলো।

দুনিয়ার যেখানে যত সুন্দর মূল্যবান জিনিস ছিলো বেহেশ্‌ত সর্বাঙ্গ সুন্দর ইয়াকুত ও মার্বেল যোগার করা হলো। লক্ষ লক্ষ মজুর ও কারিগর কাজ করতে আরম্ভ করলো। দিনরাত পরিশ্রম করে তিনশ' বছর ধরে বেহেশ্‌ত রচনা করা হলো। তা সত্য সত্যই বিচিত্র কারুকার্যময় ও অপূর্ব চমকপ্রদ হয়েছিলো।

এই বেহেশ্‌তের যে দিকে নজর দেওয়া যায় সেই দিকেই অপরূপ। চারিদিকে শ্বেত পাথরের দেওয়াল ও থাম, তাতে কুশলী শিল্পীদের চমৎকার কারুকার্য–দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দেয়ালের গায়ে নানা রঙের ইয়াকুত পাথর দিয়ে এমন সুন্দর লতাপাতা ও ফুল তৈরি করা হয়েছে যে, ভ্রমর ও মৌমাছিরা জীবন্ত মনে করে তার ওপরে এসে বসে। রঙমহলের চারিপাশে হাজার হাজার ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে, কিন্তু বাতির দরকার হয় না। অন্ধকার রাত্রেও সেই ঘরগুলো চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল।

মহলের ধারেই বসবাস ঘর ও হাওয়াখানা। মণিমুক্তা-খচিত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পাথরের কৌচ ও মেঝে সজ্জিত রয়েছে। মেঝের ওপরে নানারঙের নানা আকারের সুন্দর সুন্দর ফুলদানী, তাতে সাজানো রয়েছে জমরদ ও ইয়াকুত পাথরের নানা রকমের ফুলের তোড়া। তা থেকে আতর গোলাপ মেশক ও জাফরানের খোশবু ছুটছে।

মহলের চারিপাশে বাগান। বাগানে সোনা রূপার গাছ। তার পাতা, ফল, ফুল, নানা বর্ণের পাথর দিয়ে তৈরি। ভ্রমর ও মৌমাছিগুলো এমন সুন্দরভাবে নির্মিত যে তারা বুঝি সত্য সত্যই ফুলের ওপরে বসে মধু পান করছে। সেই সব ফুল ফল থেকে যে সৌরভ বের হচ্ছে তাতে চারিদিকের বাতাস ভর ভর করছে।

এই সব গাছের নিচে দিয়ে কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে গোলাপপানির নহর। তার পানি এত স্বচ্ছ যে, মনে হয় তরল মুক্তার ধারা বয়ে যাচ্ছে। সেই নহরের ধারে ধারে হীরা-মণি-মুক্তার বাঁধানো ঘাট। সেখানে চুনি-পান্নার তৈরি শত শত সুন্দরীরা যেন গোসল করছে।

তার পরেই নাচঘর। কোনো ঘরে ওস্তাদেরা হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে গান করছে, বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে–কোনো ঘরে কিন্নরকণ্ঠি সুন্দরী বালিকারা তালে

তালে নাচছে এবং গান গাইছে। এরাই শাদ্দাদের বেহেশ্‌তের হুরী। নানা দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে এদের এখানে জমায়েত করা হয়েছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নাচছে চাঁদের মতো খুবসুরৎ হাজার হাজার কচি কচি বালক।

অনিন্দ্য সুন্দর করে বেহেশ্‌ত নির্মাণ করা হয়ে গেলো। শাদ্দাদকে সংবাদ দেওয়া হলো। সে তখন অধীন নবাব বাদশাহদিগকে হুকুমজারি করে জানিয়ে দিলো, তারা যেন শীগগিরই শাদ্দাদের সহিত মিলিত হয়। তাদের সঙ্গে নিয়ে সে তার বেহেশ্‌ত দেখতে যাবে। প্রজাগণকে আমোদ আহ্‌লাদ করবার হুকুম দেওয়া হলো। বাদশাহের হুকুম মেনে তারা নাচ করতে লাগলো এবং হরদম বাজি পোড়াতে লাগলো।

এক শুভদিনে সুন্দর সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে পাত্র-মিত্র, উজীর-নাজীর, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, দামামা বাজাতে বাজাতে হাজার বাদশাহ তার সৃষ্ট বেহেশ্‌ত দেখতে চললো।

গল্পগুজব করতে করতে তারা এগিয়ে চললো। দূর থেকে নজর পড়লো বেহেশ্‌তের একটা অংশ। এত চমকপ্রদ, এত জমকালো যে, চোখ ঝলসে যেতে লাগলো। আনন্দে শাদ্দাদের মুখ দিয়ে কথা সরলো না। তারপর একটু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো ঃ ঐ আমার বেহেশ্‌ত! ঐ বেহেশ্‌তের সিংহাসনে আমি খোদা হয়ে বসবো, আর তোমরা হবে আমার ফেরেশতা। হুরীরা যখন হাত পা নেড়ে নাচবে আর গাইবে তখন কি মজাই না হবে।

উজীর-নাজীর ওমরাহ্‌গণ তার কথায় সায় দিয়ে তোষামোদ করে তাকে খুশী করতে লাগলো। এমনি করতে করতে তারা বেহেশ্‌তের দরজায় এসে হাজির হলো। শাদ্দাদ সকলের আগে আগে যাচ্ছিল! সে বেহেশ্‌তের দ্বারদেশে একটি রূপবান যুবক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলো। তার সুন্দর চেহারা দেখে খুশী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তুমি কি এই বেহেশ্‌তের দারোয়ান?

যুবক উত্তর করলো ঃ আমি মালাকুল মওৎ!

শাদ্দাদ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তার মানে?

যুবক উত্তর করলো ঃ আমি আজ্‌রাইল। তোমার প্রাণ বের করে নিয়ে যাবার জন্য খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন।

শাদ্দাদ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। চিৎকার করে বললো ঃ সাবধান! আমার সঙ্গে তামাসা! কে আছিস বলে অন্যের প্রতীক্ষা না করে নিজেই খাপ থেকে তরবারী বের করে যুবককে কাটতে অগ্রসর হলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য। তার হাত উঁচু হয়েই রইলো। উত্তেজনায় শরীর দিয়ে দরদর ধারায় ঘাম নির্গত হতে লাগলো। চিৎকার করে বললো ঃ সৈন্যগণ, শয়তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলো।

যুবক অট্টহাসি হেসে প্রশ্ন করলো ঃ কই তোমার সৈন্য সামন্ত?

শাদ্দাদ পিছন ফিরে দেখতে পেলো, তার লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। তারপর ভীত কণ্ঠে বললো ঃ সত্যই তুমি কি আজ্‌রাইল?

আজ্‌রাইল বললো ঃ হ্যাঁ। দেরী করবার ফুরসৎ আমার নেই। আমি এখনই তোমার প্রাণ বের করে নেবো।

শাদ্দাদ চারিদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলো। সে শিশুর মতো নিঃসহায়ভাবে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো। মিনতি করে বললো ঃ একটু সময় আমাকে দাও ভাই আজ্‌রাইল। অনেক সাধ করে আমি বেহেশ্‌ত তৈরি করেছি, একটিবার আমায় তা দেখতে দাও! এই বলে সে ঘোড়া থেকে নামবার চেষ্টা করলো।

মেঘের মতো গর্জন করে আজ্‌রাইল বললো ঃ খবরদার, এক পা এগিয়ে আসবে না। শাদ্দাদ হাউ-মাউ করতে শুরু করে দিলো। সেই অবস্থাতেই আজ্‌রাইল তার প্রাণ বের করে নিয়ে চলে গেলো।

তারপর কি হলো?

হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শাদ্দাদের অতি সাধের বেহেশ্‌ত, তার শ্রী, ঐশ্বর্য, লোক-লস্কর, উজীর-নাজীর, পাত্র-মিত্র সবকিছু চক্ষের পলকে মাটির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। দুনিয়ার ওপরে তার আর কোন চিহ্নই রইলো না। শুধু মানুষের মনে চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে রইলো আত্মম্ভরিতা অহঙ্কারের শাস্তি কিরূপ ভয়ঙ্কর।
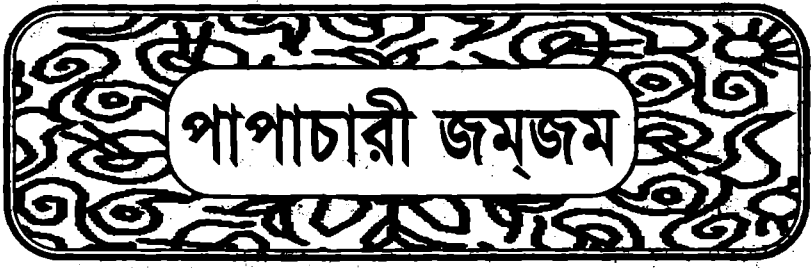
অনেকদিন আগের কথা। একদিন হযরত ঈসা সিরিয়ার পথে যেতে যেতে একটা মানুষের মাথার খুলি পড়ে রয়েছে দেখতে পেলেন। সেই খুলিটার সঙ্গে কথা বলবার জন্য তাঁর খেয়াল হলো। তিনি তখনই খোদার দরগায় আরজ করলেন ঃ হে প্রভু আমাকে এই খুলির সঙ্গে কথা বলবার শক্তি দাও।

খোদা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

হযরত ঈসা খুলিকে বললেন ঃ হে অপরিচিত কঙ্কাল, তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করবো, তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

বলবার সঙ্গে সঙ্গে ঈসা শুনতে পেলেন, পরিষ্কার ভাষায় সেই খুলিটা 'কলেমা শাহাদত' পাঠ করলো।

ঈসা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি পুরুষ না স্ত্রী?

খুলি উত্তর করলো ঃ পুরুষ।

ঈসা বললেন ঃ তোমার নাম কি?

খুলি উত্তর করলো ঃ জম্‌জম।

ঈসা আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি আগে কি ছিলে?

খুলি উত্তর করলো ঃ আমি আগে বাদশাহ ছিলাম!

ঈসা বললেন ঃ বটে। তোমার জীবনে কি কি কাজ করেছিলে?

খুলি উত্তর করলো ঃ আমি আগে একজন বাদশাহ ছিলাম। ধন-দৌলত, লোক-লস্কর আমার এত বেশি ছিলো যে, দুনিয়ার বাদশাহরা তা দেখে অবাক হয়ে যেতো।

তারা আমাকে খুব ভয় আর সম্মান করতো। আমি কিন্তু কারো ওপর কোন অত্যাচার করতাম না। গরীব-দুঃখীদের সাধ্যমতো দান করতাম। সমস্ত দিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু ভুলেও কখনো খোদার নাম মুখে আনতাম না। এমনি করে অনেকদিন আমি বাদশাহী করেছিলাম। একদিন দরবারে বসে কাজ করছি, এমন সময় হঠাৎ আমার মাথা ব্যথা হলো। যন্ত্রণা ক্রমে বাড়তে লাগলো, আর বসতে পারলাম না। রঙমহলে চলে গেলাম। সেবা-শুশ্রূষা চলতে লাগলো। কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠলো। যেখানে যত বড় হেকিম ছিলো, চিকিৎসার জন্য তাদের সকলকে ডাকা হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা আওয়াজ আমার কানে ঢুকলো। কেহ যেন চিৎকার করে বলছে ঃ জমজমের প্রাণ বের করে দোজখে ফেলে দাও। সেই সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট মূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। উঃ, কি ভীষণ তার চেহারা। দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর কি হলো আমার মনে নেই। যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলাম প্রাণ নিয়ে যাবার জন্য আজরাইল একা আসেনি—তার সঙ্গে আরো অনেক ফেরেশ্‌তা এসেছে। তাদের কারো হাতে লোহার ডান্ডা, কারো হাতে শিক, কারো হাতে তলোয়ার। সমস্তই আগুনের পোড়ান জবাফুলের মতো রাঙা। তারা সেই সমস্ত দিয়ে আমাকে সেঁকা ও খোঁচা দিতে লাগলো। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলতে লাগলাম ঃ ওগো, তোমরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় মেরো না। আমায় ছেড়ে দাও। আমার ভান্ডারে যত ধন-দৌলত হীরা-জহরৎ আছে সব তোমাদের দেবো। এই কথা শুনে তাদের মধ্যে একজন লোহার মতো শক্ত হাতে আমার গালে একটা চাপর দিয়ে বললো ঃ রে নাদান! খোদা কারো ধন-দৌলতের পরোয়া করে না।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতরভাবে তাদের কাছে মিনতি করে বললাম ঃ ওগো তোমরা আমায় ছেড়ে দাও। তার বদলে আমার বংশের প্রত্যেক লোককে আমি খোদার নামে কোরবানী করবো। এই বলেই তাদের দয়ার ভিখিরী হয়ে কাতর নয়নে তাদের দিকে চেয়ে রইলাম। তারা দাঁত কড়মড় করে ধমক দিয়ে বললো ঃ রে বেয়াদব! খোদা কি ঘুষখোর?

আজ্‌রাইল তখন ফেরেশ্‌তাদের বললেন ঃ আর দেরী করো না, এখনই এর প্রাণ বের করে দোজখে ফেলে দাও।

তারপর তারা আমার প্রাণ বের করে নিয়ে গেলো।

তারপর কি হলো আর জানবার ক্ষমতা রইলো না। হঠাৎ মনে হলো যেন আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখ খুললাম। আমি কোথায় আছি প্রথমে বুঝতেই পারলাম না। অন্ধকার, চারিদিকে ঘন অন্ধকার–আলো নেই, বাতাস নেই। এই অবস্থা আমার অসহ্য হয়ে উঠলো, ক্রমে বুঝতে পারলাম যে আমাকে কবর দেওয়া হয়েছে আর সেই কবরের মধ্যে যেন হাজার ফেরেশ্‌তা এক সঙ্গে চিৎকার করে বলছে ঃ রে নাদান! আমরা তোর প্রাণ বের করে নিয়ে গিয়েছিলাম পুনরায় তোর দেহের মধ্যে প্রাণ দিয়েছি। এখন এই কাফনের কাপড়ের উপর লেখ, দুনিয়ায় তুই কি কি কাজ করেছিস।

জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা করেছি সব আমার মনে স্পষ্ট জাগতে লাগলো। আমি এক এক করে অল্প সময়ের মধ্যে লিখে ফেললাম।

তারপর ফেরেশ্‌তারা ভয়ানক গর্জন করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বল তোর খোদা কে?

আমি ভয়ে ভয়ে উত্তর করলাম ঃ তোমরাই আমার খোদা। আমি অন্য খোদা জানি না। তোমরা আমাকে রক্ষা করো।

এই কথা শুনে তারা ভয়ানক রেগে গেলো। লোহার ডান্ডা দিয়ে আমাকে বেদম প্রহার আরম্ভ করলো। তারপর মনে হতে লাগলো, কবরের মাটি চারিদিক থেকে যেন আমাকে পিষে ফেলবার চেষ্টা করছে। ক্রমে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। মাটি চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ রে বেঈমান! শত শত বৎসর আমার পিঠের উপরে বাদশাহী করে কত অত্যাচার করেছিস্‌ আর খোদার না-ফরমানী করেছিস্‌ তাই তোর এই শাস্তি। এই কথা বলে মাটি আমার হাড়গুলোকে গুঁড়ো করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছি এমন সময়ে কতকগুলি ভীষণ-মূর্তিজীব আমাকে ধরে ওপরে নিয়ে গেলো। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবলাম, খোদা মেহেরবানি করে

আমাকে মাফ করবেন। কিন্তু সে ভরসা শূন্যে মিলিয়ে গেলো যখন দেখলাম তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেলো আর একজন লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বিকট চেহারার লোকের কাছে। সে লোকটা ভীষণ চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ এই কম্‌বখ্‌তকে (হতভাগ্যকে) আগুনের শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো, তারপর পায়ের দিক থেকে উল্‌টো করে ছিঁড়ে ফেলো।

তারা তখনই প্রভুর হুকুম তামিল করতে আরম্ভ করলো। এরপর তারা আমাকে পচা দুর্গন্ধময় একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলো।

ক্ষুধায়, পিপাসায় আর অসহ্য যন্ত্রণায় হৃদপিন্ড যেন বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। আমি কাতরভাবে তাদের বললাম ঃ দোহাই তোমাদের, আমাকে এক পাত্র পানি দাও।

ফেরেশ্‌তারা কিসের রস এনে আমাকে খেতে দিলো। চোখ বুঁজে সেই রস মুখের মধ্যে ঢেলে দিলাম। উঃ, কি বিশ্রী দুর্গন্ধ? মনে হতে লাগলো এ জিনিস না খাওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিলো! চিৎকার করে বলতে লাগলাম ঃ কে আছ, আমায় এক পাত্র পানি দাও, পিপাসায় আমার প্রাণ যায়।

সেই কাতরোক্তি শুনে অপর একজন ফেরেশ্‌তা এক গ্লাস পানি নিয়ে এলো। মনে ভরসা হলো, এইবার বুঝি বেঁচে গেলাম। চোখ বুঁজে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পান করলাম। উঃ এ যে আরো কটু ও দুর্গন্ধ! সমস্ত অন্তরটা জ্বলে যেতে লাগলো। নাক, মুখ, চোখ, কান এমন কি লোমের গোড়া দিয়ে পর্যন্ত দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো। আমি চিৎকার করতে লাগলাম ঃ তোমরা এমন তিল তিল করে যাতনা দিয়ে আমাকে না মেরে যা করবার একেবারেই করে ফেলো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।।

তারা কেউ আমার কথা গ্রাহ্য তো করলোই না বরং আমার সেই অবস্থা দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। আমি যতই যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলাম, ততই তারা হো-হো করে হাসতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে একজন ভীষণদর্শন ব্যক্তি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তার ভয়াবহ আকৃতি দেখে আমার বুক শুকিয়ে গেলো। সে তার বিষ-মাখান লম্বা নখে আমাকে গেঁথে শূন্যে সোকরাৎ নামক এক পাহাড়ে নিয়ে গেলো। সেই পাহাড়ে সাতটা কূপ। প্রত্যেক কূপ থেকে বিষাক্ত গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। প্রত্যেক কূপে

হাজার হাজার বিষাক্ত সাপ ও বিছা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করছে আর তাদের মুখের বিষ-নিঃশ্বাসের এই ধুম নির্গত হচ্ছে। ফেরেশ্‌তারা আমার চুল ধরে সেই কূপের মধ্যে ফেলে দিলো। সাপ-বিছারা চারিদিক থেকে আমাকে কামড়াতে আরম্ভ করে দিলো। জ্বালায় চিৎকার করতে লাগলাম।

তারপর তারা আমাকে এক পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। সে পুকুরে পানি নেই, শুধু পুঁজ, রক্ত ও বিষে ভরা সেই পুকুর। আমার চুল ধরে সেই পুকুরের মধ্যে জোর করে তারা ডুবিয়ে রাখলো। যতই ওপরে উঠার চেষ্টা করি, ততই তারা জোর করে আমাকে চেপে ধরে রাখতে লাগলো। এই রকম করে এক কূপ থেকে আর এক কূপে এবং এক পুকুর থেকে আর এক পুকুরের হাজার বার ডুবিয়ে হাজার বার তুলে একশত বছর ধরে আমাকে কষ্ট দিলো।

তারপর আজ হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন কাকে বলছে, যে পথে হযরত ঈসা যাচ্ছেন সেই পথে জম্‌জমকে দোজখ থেকে তুলে ফেলে দাও। দুনিয়াতে সে অনেক ভাল কাজও করেছিলো। অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করেছিলো। সে আজ তার পুরস্কার পাবে। সে খোদার নাম একবারও মুখে আনেনি বলে যে পাপ করেছিলো তার শাস্তি পুরোমাত্রায় ভোগ করবার পর আবার দুনিয়াতে যাবে।

ঈসা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ জম্‌জম্‌ তুমি আমার কাছে কি চাও?

জম্‌জম্‌ বললো ঃ তুমি খোদার কাছে এই প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন।

ঈসা দুই হাত তুলে জম্‌জমের জন্য খোদার কাছে আরজ করলেন। তারপর বললেন ঃ জম্‌জমের হাড় মাংস সমস্ত একত্র হয়ে পুনর্জীবন লাভ করুক।

বলতে না বলতে একটি সুদর্শন যুবক মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হযরত ঈসাকে সালাম করলো।
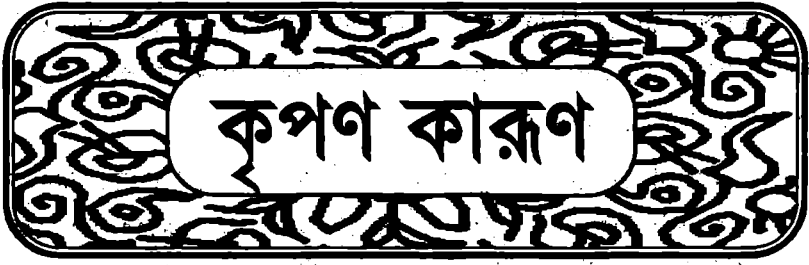
তোমরা হয়তো জানো মাটির নিচে সোনা, রূপা, হীরা, মণি-মাণিক্যের খনি এবং সমুদ্রের নিচে ইয়াকুত, জম্রদ, প্রবাল ও মুক্তা অনেক আছে। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, এই সবই আগে একজন মাত্র লোকের সম্পত্তি ছিলো।

এত বড়ো ধনী পৃথিবীতে আর একজনও ছিলো না এবং আর কেউ কখনো হবে না। তার সেই ধনসম্পত্তি দুনিয়াময় কিরূপে ছড়িয়ে পড়লো এবং ভূগর্ভে ও সমুদ্রের মধ্যে কেমন করে প্রবেশ করলো সেই আজব কাহিনী আজ তোমাদের কাছে বলবো।

হযরত মুসার জ্ঞাতি সম্পর্কীয় এক চাচাতো ভাই-নাম ছিলো তার কারূণ। কারূণের বরাত ছিল খুব ভাল। দুনিয়ার সব জায়গায় তার মালগুদাম ছিলো। সমস্ত নদীতে ও সমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে তার নৌকা ও জাহাজ চলাফেরা করতো। পৃথিবীর সকল সওদাগরের সে ছিলো একমাত্র মহাজন, সুতরাং সমস্ত কাজ কারবারের মূল। নিজেও কারবার করে সে অনেক অর্থ উপার্জন করতো এবং সওদাগরীর মুনাফা থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তার আয় হতো।

হযরত মুসা তাকে খুব ভালবাসতেন। তাকে আদর করে মাটি দিয়ে সোনা তৈরি করবার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এসব নানা ব্যাপারে চারিদিক থেকে কত টাকা যে তার আয় হতো তার লেখাজোখা ছিলো না। এই সব টাকার বদলে সে হীরা, মণি, মুক্তা, জহরৎ, চুনি, পান্না, ইয়াকুত, জমরদ যোগাড় করে লক্ষ লক্ষ সিন্দুক বোঝাই করে রাখতো। সেই সমস্ত সিন্দুকের চাবি একটা মজবুত সিন্দুকে রেখে সেই সিন্দুকের চাবি দড়িতে বেঁধে নিজের কোমরে সর্বদা ঝুলিয়ে রাখতো। সারাদিন রাতের মধ্যে তাকে বড়

একটা কেউ বাইরে দেখতে পেতো না। চাবি হাতে করে সে প্রত্যেক দিন গুদামে গুদামে ঘুরে বেড়াতো। তোমরা হয়তো ভেবেছো, এত যার টাকাকড়ি ধন-দৌলত সে নিশ্চয় খুব বিলাসী এবং ব্যয়ে মুক্ত হস্ত ছিলো। কিন্তু বিলাস বা সখ তার বিন্দুমাত্র ছিলো না। একটা ছিন্ন ময়লা তালিযুক্ত পায়জামা এবং গায়ে একটা জামা ও পায়ে একজোড়া চটি জুতা ছিলো তার বেশ। ছেঁড়া চাটাই পেতে মাটিতে শুয়ে সে রাত্রি কাটাতো। দুই একখানি শুকনো রুটি, কিছু খেজুর ও কয়েক পাত্র পানি ছিলো তারা সারাদিনের আহার্য। কথিত আছে, কিছুদিন পরে তাও নাকি সে গ্রহণ করতো না। একখানি মাত্র রুটি এক পাত্র পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি পান করে জীবন ধারণ করতো, তারপর সেই রুটিটি শুকিয়ে রাখতো। আত্মীয়-বন্ধু তাকে বলতো ঃ তোমার এত ধন-দৌলত তুমি মিছামিছি এত কষ্ট করো কেন? তুমি একজোড়া ভাল জুতা কিংবা একটা জামাও কিনতে পারো না?

কারূণ হেসে বলতো ঃ বাঃ তোমরা তো আমাকে বেশ পরামর্শ দিচ্ছো! ক'টা পয়সা বা আমি সিন্দুকে বাক্সে তুলেছি যে তোমরা আমাকে ধনী ধনী বলে ঠাট্টা করছো। এখন আমিরী করে এ ক'টি পয়সা যদি খরচ করে ফেলি তবে বুড়ো বয়সে ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করলে দেবে কে বলো? তোমরা আমাকে পথে বসাবার বেশ ফন্দি করছো দেখছি।

উপদেশ-দাতারা এই কথা শুনে অবাক হয়ে চলে যেতো।

মুসা একদিন বললেন ঃ কারূণ খোদা তোমাকে এত ধন-দৌলত দিয়েছেন, তার একটা সামান্য অংশ গরীব দুঃখীদের মধ্যে জাকাত (দান) দেওয়া তোমার উচিত। ধর্মে নিয়ম আছে যে, শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দিতে হয়। আশা করি তুমি শতকরা একটি টাকা জাকাত দেবে।

কারূণে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ চেয়ে বললো ঃ জাকাত কাকে বলে?

মুসা বললেন ঃ শতকরা এক টাকা গরীব-দুঃখীদের দান করাকে জাকাত বলে।

অন্য কেউ যদি কারূণকে দান করার কথা বলতো তাহলে সে কি করতো বলা যায় না, কিন্তু মুসা সম্পর্কে তার বড় ভাই, কখনো তাঁর কথা সে অমান্য করেনি, সুতরাং

মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জবাব দিলো ঃ দেখতেই পাচ্ছো আমি অতি গরীব, টাকা-পয়সা কোথায় পাবো যে জাকাত দেবো?

মুসা বললেন ঃ কারূণ এত যার ধন-দৌলত সে যদি গরীব হয় তবে ধনী লোক কাকে বলে?

কারূণ প্রত্যুত্তর করলো ঃ খেয়ে না খেয়ে, কত কষ্ট করে ক'টি পয়সাই বা জমেছে, তা' যদি এখন দান-খয়রাত করে বসি বুড়ো বয়সে খাবো কি? ভিক্ষা করা ছাড়া তো আমার কোন উপায় থাকবে না ভাই। আমাকে মাফ করো, জাকাত আমি দিতে পারবো না।

মুসা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ খোদা তোমাকে এত দিয়েছেন যে, তুমি যদি সারাজীবন দান করো তা' হলেও শেষ হবে না।

কথা শুনে কারূণ হো-হো করে হেসে উঠলো। বললো ঃ না বুঝে দান করলে রাজার রাজত্ব উড়ে যায়, আর আমার তো সামান্য ঐ ক'টা পয়সা ও আর উড়তে কতক্ষণ!

মুসা বললেন ঃ তুমি গরীব কি ধনী সে তর্ক তোমার সঙ্গে করতে আসি নাই। জাকাত দেওয়া তোমার পক্ষে একান্ত কর্তব্য, তাই তোমায় বলতে এসেছি। তুমি জাকাত দেবে কি না বলো?

নিরুপায় হয়ে কারূণ তখন আমতা আমতা করে বললো ঃ আচ্ছা আজ ভেবে দেখি কাল জবাব দেবো।

কারূণের মনে আনন্দের লেশ মাত্র নেই। সমস্ত দিন তার একরূপে অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় কাটলো। কি করা যায়, মুসাকে কি জবাব সে দেবে, ভেবে-চিন্তে কিছুই সে ঠিক করতে পারলো না। দিন গত হয়ে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। একটা প্রদীপ জ্বেলে কারূণ হিসাব করতে বসলো। একশত টাকায় এক টাকা, হাজার টাকায় দশ টাকা, এক লক্ষ টাকায় হবে এক হাজার! কারূণ আর হিসাব করতে পারলো না, তার মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে লাগলো। খানিক পরে আবার হিসাব করতে লাগলো, এক লক্ষ টাকায় যদি এক হাজার টাকা হয় তাহলে এক কোটি টাকায় হবে এক লক্ষ টাকা।

কারূণ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো ঃ মুসা, তোমার উপদেশ শোনার পরিবর্তে আমার বুকে ছুরি মেরে আমাকে মেরে ফেলো। এক কোটি টাকায় এক লক্ষ টাকা আমায় দিতে হবে জাকাত! কেন? গরীব-দুঃখীরা তো টাকা রোজগার করে আমার কাছে জমা রাখেনি যে, আমাকে তাদের দান করতে হবে? আমি দেবো না, এক পয়সাও আমি দেবো না। কারূণ বালিশে মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে রইলো এবং মনে মনে মুসার মুণ্ডপাত করতে লাগলো। সে রাত্রে কারূণ আর ঘুমুতে পারলো না। হঠাৎ প্রদীপটার দিকে তার নজর পড়তেই চমকে উঠলো ঃ আঃ তেল সবটা পুড়ে গেলো দেখছি অথচ এক পয়সাও আয় হলো না। বলে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সারারাত বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

পরদিন সকাল হতে না হতেই মুসা কারূণের বাড়িতে এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিছু ঠিক করতে পেরেছো কি কারূণ?

কারূণ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বললো ঃ কি ঠিক করার কথা বলছো, সেই জাকাতের কথা? এ যাঃ একেবারেই ভুলে গেছি। আচ্ছা আজ তুমি যাও। কাল ঠিক তোমার কথার জবাব দেবো।

মুসা চলে গেলেন।

কিন্তু পরদিনও এমনি ব্যাপার। এমনি করে রোজ রোজ মিথ্যা ওজর দেখিয়ে কারূণ দিন কাটাতে লাগলো।

একদিন মুসা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ তোমার কি একটুখানি লজ্জা সরমও নেই কারূণ—রোজই টালবাহানা করো। আমি এখনই শুনতে চাই জাকাত দেবে কি না।

কারূণও খুব রাগের সঙ্গে জবাব দিলো ঃ তুমি কি মনে করো তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না। খেয়ে না খেয়ে, কত কষ্ট করে কিছু সঞ্চয় করেছি তা দেখে তোমাদের চোখ জ্বালা করছে। ফন্দি আটছো, কেমন করে সেগুলো বার করে তোমরা লুটপাট করে নেবে। অত বোকা আমি নই। সেটি কখনও হবে না। আমি এক পয়সাও দান-খয়রাত করবো না। তুমি যা খুশী করতে পারো।

মুসা অবাক! কিন্তু হতাশ হলেন না।

আরও অনেকদিন ধরে তিনি কারূণকে উপদেশ দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌তা'লার গজবের ভয় পর্যন্ত দেখালেন, দোজখের দুঃখ, বেহেশ্‌তের সুখের কথা বললেন। কিন্তু কারূণ অটল–কিছুতেই তার মন গললো না।

এবার মুসা নিরুপায় হয়ে পড়লেন। তিনি খোদার দরগায় এই প্রার্থনা করলেন ঃ হে প্রভু, কারূণকে সৎকার্যে দান করবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম কিন্তু তার সদবুদ্ধি হলো না। এখন তোমার আদেশ আমাকে জানাও!

জিব্‌রাইল খোদার আদেশ নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলেন। মুসাকে বললেন ঃ মুসা, তুমি বনি-ইসরাইলদের মিশর থেকে চলে যেতে বলো।

মুসা সে আদেশ পালন করলেন।

জিব্‌রাইল জানালেন ঃ এখন থেকে বসুমতী তোমার আজ্ঞাধীন হলো। তার দ্বারা তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য করতে পারো।

কয়েকদিন পরে মুসা পুনরায় কারূণের নিকট এসে তাকে বললেন ঃ কারূণ, তুমি সৎকার্যে দান করো, খোদার পথে জাকাত দাও, নতুবা তোমার মহা অন্যায় হবে।

কারূণ জবাব দিলো ঃ ভাই মুসা, তোমার এ-কথা অনেকদিন থেকে শুনে আসছি। কোন নতুন খবর থাকে বলতে পারো–বলে সে চলে যেতে উদ্যত হলো।

মুসা তাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ এখনও হুঁশিয়ার।

কারূণ বললো ঃ হুঁশিয়ার আগে থেকেই হয়ে আছি।

এই কথা বলতে না বলতে তার পা দু'টি মাটির মধ্যে ঢুকে গেলো ঃ ব্যাপার দেখে কারূণের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো, কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ না করে বললো ঃ তুমি তো বেশ যাদু শিখেছো দেখছি! এই রকম ফন্দী ফিকির করে আমার টাকাকড়ি সব লুট করতে চাও নাকি?

এই কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কোমর পর্যন্ত মাটির মধ্যে প্রবেশ করলো। বিস্ময় ও ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেলো। বললো ঃ বাঃ বেশ তো ভেলকী শিখেছো! চালাকি করে টাকা আদায় করবে এমন কচি খোকা পাও নি।

এবারে তার গলা পর্যন্ত মাটির মধ্যে ডুবে গেলো।

তখন সে চিৎকার করে মুসাকে বললো ঃ তুমি কি এমন করে আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি?

মুসা ধমক দিয়ে বললো ঃ খবরদার, এখনও যদি খোদার নামে সৎকাজে দান করো তাহলে পরিত্রাণ পেতে পারো।

কারূণ বললো ঃ আমার যথাসর্বস্ব দান করে ভিক্ষে করে খাবার জন্য বেঁচে থাকতে আমি চাইনে।

সে আরো খানিকটা মাটির মধ্যে ঢুকে গেলো। তার দাড়ির হাড় ঠক করে মাটিতে এসে ঠেকলো। হাতের খানিকটা তখন অবধি বাইরে ছিলো। এইবার কারূণ হেসে ফেললো।

মুসা দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি হাসছো কেন?

কারূণ জবাব দিলো ঃ যে আশায় তুমি আমাকে মারবার চেষ্টা করছো সে আশা তোমার পূর্ণ হবে না। কারণ সমস্ত সিন্দুকের চাবি যে সিন্দুকে বন্ধ করা আছে–এই দেখ সেই চাবি আমার মুঠোর মধ্যে রয়েছে। দুনিয়াতে এমন কোন হাতিয়ার নেই যা দিয়ে সেই সিন্দুক কাটতে বা ভাঙতে পারবে, কাজেই আমাকে মেরে কোন লাভ নেই।

মুসা বললেন ঃ মূর্খ, গরীব দুঃখীকে দান করো, খোদার পথে জাকাত দাও–তোমার জীবন রক্ষা হবে।

কারূণ কিছু জবাব দিলো না–শুধু সিন্দুকটার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

মুসা বললেন ঃ কারূণ তোমার কি বাঁচার ইচ্ছা হয় না?

কারূণ মুসার দিকে চোখ না ফিরিয়েই চিৎকার করে বললো ঃ না একেবারে না।

মুসা প্রশ্ন করলেন ঃ বাঁচতে ইচ্ছা হয় না কেন?

কারূণ জবাব দিলো ঃ কেন জানতে চাও? আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে তোমরা আমায় 'ধনী' ধনী বলে পাগল করে দিতে, আর হয়তো দান-খয়রাত করিয়ে সমস্ত বিষয় আশয় লুটিয়ে দিয়ে আমাকে পথে বসাতে। সুতরাং টাকা কয়টা থাকতে থাকতেই আমার মরা উচিত।

মুসা আবার বললেন ঃ কারূণ তোমার কি একেবারে বাঁচতে ইচ্ছা হয় না?

এবারে কারূণ রেগে চোখ লাল করে বললো ঃ টাকার বদলে আমার বাঁচতে ইচ্ছে হয় না।

তারপর আস্তে আস্তে তার নাক, মুখ মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। দেখতে দেখতে কারূণের দালান-কোঠা, ধন-দৌলত, সিন্দুক-বাক্স সমস্তই মাটির মধ্যে চলে গেলো।
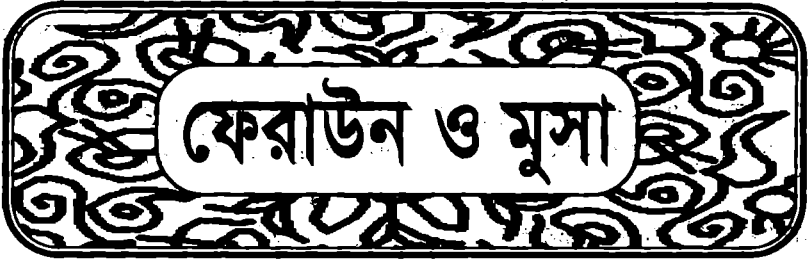
মহাপ্লাবনের পর বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে। নূহের বংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বংশে একজন পরম ধার্মিক লোক জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম ইস্‌রাইল। তিনি যে দেশে বাস করতেন তার নাম কেনান্। মিশরের বাদশাহ্ ফেরাউন তাঁকে মিশরে এসে বাস করার আমন্ত্রণ করেন।

তিনি ইস্‌রাইলকে যথেষ্ট প্রীতির চক্ষে দেখতেন। ফেরাউন কালক্রমে পরলোক গমন করলে অপর একজন ফেরাউন সিংহাসনে উপবেশন করলেন। ফেরাউন কোন লোকের নাম নয়। মিশরের বাদশাহ্‌দিগকে ফেরাউন বলা হতো, ইহা পদবী যাহা হউক, পরের এই ফেরাউন অত্যাচারী ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী ফেরাউনের একজন উজীর ছিলেন। প্রথমে তিনি খুব সৎস্বভাবের লোক ছিলেন। নানা রকমে প্রজাদের উপকার করতেন।

কোন বৎসর অজন্মা হলে তিনি নানা রকম কৌশল করে প্রজাদের খাজনা মওকুফ করবার বা শোধ করবার ব্যবস্থা করতেন। যদি রাজ্যে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো তাহলে তিনি বাদশাহের ধনাগার থেকে কৌশলে অর্থ বের করে গরীব প্রজাদিগকে অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করতেন। এইজন্য প্রজারা তাঁকে খুব বেশি সম্মান ও ভক্তি করতো। ফেরাউন গত হলে মিশর দেশের লোকেরা তাঁকেই তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু বাদশাহ হবার পর তার মনের অবস্থা যেন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তিনি ইসরাইল ও তার বংশধরগণের ওপরে অত্যাচার আরম্ভ করলেন। তিনি অনেক

দেশ জয় করে তাঁর রাজ্য আরও বৃদ্ধি করলেন। চারদিক থেকে রাজস্ব ও উপঢৌকন এসে তার ধনাগার পূর্ণ হতে লাগলো। সাধারণ ব্যক্তি সহসা বিত্তশালী হলে তার মনে অহঙ্কার জন্মে এবং তার নানা কু-পরামর্শদাতাও জোটে। সুতরাং ফেরাউনেরও এমন হিতৈষী বন্ধুর অভাব ঘটল না। হামান নামক একজন কূটবুদ্ধি উজীর তাঁকে দুনিয়ার বাদশাহ হবার স্বপ্ন দেখাতে লাগলো। প্রজারা যাতে নীরেট মূর্খ হয়ে থাকে এবং তাকে খোদা বলে মান্য করে তার জন্য নানা যুক্তি-পরামর্শ দিতে লাগলো।

মন্ত্রী হামানের পরামর্শ মতো ফেরাউন সমগ্র রাজ্যের মাতব্বর প্রজাদের ডেকে একটা বড় সভা করলেন। সেই সভাতে তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, লেখাপড়া শিখে মিছামিছি সময় নষ্ট করবার আর প্রয়োজন নেই। কারণ, লোকের পরমায়ু অতি অল্পকাল। এই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে জীবনের বেশির ভাগ দিনই যদি মক্তবে এবং পাঠশালায় গমনাগমন করে এবং পড়ার ভাবনা ভেবে ভেবে কাটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আমোদ আহলাদ এবং স্ফূর্তি করবার অবসর পাওয়া যাবে না। সুতরাং সারাজীবন ভরে আমোদ করো–মজা করো। তাহলে মরবার সময়ে মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ আসবে না।

প্রজারা ফেরাউনের ও হামানের এই উপদেশ সানন্দে গ্রহণ করলো এবং বংশধরদের কাউকে আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলো।

অতঃপর হামান পাঠশালা ও মক্তব রাজ্য থেকে উঠিয়ে ঢাক পিটিয়ে দেশময় প্রচার করে দিলো যে, কেউ আর লেখাপড়া শিখতে পারবে না। রাজার আদেশ অমান্য করলে সবংশে তার গর্দান যাবে।

প্রজারা ফেরাউনের আদেশ মতো চলতে লাগলো। লেখাপড়া আর কেউ শিখতে চেষ্টা করলো না। সারাদেশে কিছুকালের মধ্যে একেবারে গন্ডমুর্খতে পূর্ণ হয়ে গলো। মূর্খের অশেষ দোষ। কোন ধর্মাধর্ম, হিতাহিত জ্ঞান তার থাকে না। তারা হয় কান্ডজ্ঞানবিবর্জিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দুনিয়ার এমন কোন অসৎ কাজ নেই যা মূর্খে না করতে পারে! যখন তার রাজ্যের প্রজাদের এই অবস্থা ফেরাউন মনে মনে হাসতে লাগলো। তার উদ্দেশ্য এতদিনে সিদ্ধ হয়েছে। তিনি প্রত্যেককে একটা করে নিজের প্রতিমূর্তি দিয়ে তাকে সৃষ্টিকর্তা এবং উপাস্য খোদা বলে পূজা করতে হুকুম দিলেন।

নিজের ঘরে বসে যদি খোদার উপাসনা করা যায় তবে কেউ কি মস্‌জিদে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে চায়? ফেরাউনের আদেশে সকলে সন্তুষ্ট হলো। এমন করে অনেক দিন কেটে যাওয়ার পর একদিন তিনি প্রজাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কাকে খোদা বলে মানে?

তারা বললো ঃ ফেরাউনের প্রতিমূর্তিকেই খোদা বলে মান্য করে।

কিছুদিন যায়। একবার অনাবৃষ্টির জন্য দেশে দারুণ অজন্মা হয়েছিলো। এমন কি নীলনদের পানি পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিলো। প্রজারা সুযোগ পেয়ে বাদশাহকে বললো ঃ জাঁহাপনা আপনি যদি খোদা হন, তবে আপনি খোদার মতো ক্ষমতা আমাদের একবার দেখান। এবার বৃষ্টির অভাবে নীলনদ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে এবং মাঠের সমস্ত ফসল পুড়ে গেছে। আপনি নীলনদ পানিতে পূর্ণ করে আমাদের ফসল রক্ষা করে দেবার ব্যবস্থা করে দিন।

এবার ফেরাউন বড় বিপদে পড়লেন! কিন্তু চতুরতার সঙ্গে তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ এ আর এমন বেশি কথা কি! আগে এ সংবাদ আমায় জানাও নি কেন? আজ আমার অনেক কাজ–আজ সময় হবে না। আগামীকাল তোমাদের নীলনদ পানিতে ভর্তি করে দেবো। তোমরা সেই পানি দিয়ে ফসল রক্ষা করো।

প্রজারা খুশী হয়ে বাড়ি চলে গেলো।

প্রজারা বিদায় হলে ফেরাউন চিন্তা করতে লাগলেন, কি করা যায়! সারাদিন কেটে গেলো–তারপর সন্ধ্যা হয়ে এলো। গভীর রাত্রে একাকী ঘোড়ায় চড়ে রাজধানী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। শহর থেকে ময়দান, ময়দান পার হয়ে গ্রাম, গ্রাম পার হয়ে এক ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে ছিল এক মস্ত বড় কূপ। সে কূপের ধারে এসে ফেরাউন ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর একগাছি দড়ি আপনার পায়ে বাঁধলেন, সে দড়ি একটা গাছের গোড়ায় শক্ত করে বেঁধে সেই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। দোদুল্যমান অবস্থায় তিনি উচ্চঃস্বরে কেঁদে কেঁদে খোদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ হে দয়াময় প্রভু, তুমি অনেক পাপীর ইচ্ছা পূরণ করছো। এক্ষণে আমি বিপদগ্রস্ত। আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো মালিক। এবারের মতো তুমি আমার মান বাঁচাও।

তা' না হলে আমি রাত্রি প্রভাতে আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। পরকালে তুমি আমাকে যে শাস্তি হয় দিও।

এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, ওপর থেকে কে যেন বলছেন ঃ ফেরাউন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। নীলনদ তোমার আদেশ মতো চলবে।

এই দৈববাণী শুনে ফেরাউন আনন্দে অধীর হয়ে কূপ থেকে উঠে রাজধানীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই প্রজারা প্রাসাদের সমুখে এসে সমবেত হতে লাগলো। ফেরাউন তাদের সঙ্গে নিয়ে নীলনদের কাছে এসে হাজির হলেন ঃ চিৎকার করে বললেন ঃ নীলনদ পানিতে পূর্ণ হয়ে থাকো।

কথা শেষ হতে না হতে শুষ্ক নদীর তটভূমি জোয়ারের পানিতে ভরে উঠলো। দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র পানিতে পরিপ্লুত হয়ে গেলো।

প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ করলো ঃ জাঁহাপনা জমি জমা ডুবে গিয়ে ফসল নষ্ট হয়ে যাবার মতো হলো। হুজুর আমাদের জমির পানি একটু কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

ফেরাউন তাদের প্রার্থনা মতো নীলনদকে আদেশ করলেন। পানি সরে গেলো প্রজারা খুশী হয়ে তাকে খোদা বলে বিশ্বাস করে নিলো। এরা কপ্‌তী শ্রেণীর লোক। কিন্তু বনি ইসরাইল নামে অপর এক শ্রেণীর লোক ছিল, তারা তাকে কোনক্রমেই খোদা বলে স্বীকার করলো না। কিন্তু ফেরাউন নানা অসম্ভব ও আশ্চর্য কাজ করে প্রজাদের মনে দিনে দিনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে লাগলেন যে, তিনিই প্রকৃত খোদা।

ফেরাউনের এক পোষ্যপুত্র ছিলেন, নাম মুসা। তিনি কখনো তাকে খোদা বলে স্বীকার করতেন না। মুসার জন্ম সম্বন্ধে একটা কাহিনী আছে। মিশরে ইসরাইলদের বংশ খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলো। ইসরাইলগণ ফেরাউনকে অবিশ্বাস এবং উপহাস করতেন এজন্য ফেরাউন এদের মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি নিয়ম করলেন যে, ইসরাইলদের পুত্রসন্তান হলেই তাকে নীলনদের পানিতে ফেলে দিতে হবে। এমনিভাবে কত সন্তান যে বধ করা হলো তার সীমা সংখ্যা নেই।

একদিন ফেরাউনের স্ত্রী গোসল করতে এসে হঠাৎ দেখতে পেলেন নীলনদের ধারে নলবনের মধ্যে একটা সিন্দুক ভেসে এসে আটকে রয়েছে। সেই সিন্দুকের ঢাকনা খুলে দেখতে পেলেন একটি ফুটফুটে ছেলে ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন, ছেলেটি ইসরাইলদের। শিশুটি দেখে তার অতিশয় মমতা হলো। তিনি তাকে পালন করবেন ঠিক করলেন। একজন ধাত্রীও পাওয়া গেলো। তার হাতে ছেলের ভার দেওয়া হলো। ছেলেটির নাম রাখা হলো মুসা।

সেই ধাত্রী অপর কেউ নন, তিনি মুসার গর্ভধারিনী। কালক্রমে ছেলেটি বড় হয়ে উঠলে তাকে ফেরাউনের স্ত্রীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। মুসা মিশরীদের সঙ্গে রইলেন বটে, কিন্তু সব সময় তাঁর মনে হতো তিনি যেন ইসরাইলী। একদিন মুসা দেখলেন, একজন মিশরীয় একজন ইসরাইলীকে বেদম প্রহার করছে। তিনি মিশরীয় লোকটিকে হত্যা করে বালিতে পুঁতে ফেললেন।

ফেরাউনের কাছে খবর গেলো। তিনি মুসাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। মুসা তখন পালিয়ে মিদিয়ান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে এক কৃষকের কন্যাকে বিবাহ করলেন। তারপর মাঠে মেষ চড়িয়ে কাল কাটাতে লাগলেন।

অনেকদিন চলে যাবার পর একদিন মুসা তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারুনকে সঙ্গে নিয়ে ফেরাউনের দরবারে এসে হাজির হলেন। বললেন ঃ আপনি যে নিজেকে খোদা বলে প্রচার করছেন, এ অত্যন্ত অন্যায়। সর্বশক্তিমান খোদা ছাড়া আর কেউ মানবের উপাস্য নেই। আমি খোদার প্রেরিত পয়গম্বর।

ফেরাউন তাঁকে তাচ্ছিল্য করে হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, কেমন করে বুঝবো যে, খোদা তোমাকে পাঠিয়েছেন? তুমি তার কোন প্রমাণ দিতে পারো?

মুসা হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই লাঠি ভয়ানক অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেলো। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে সে যখন এগিয়ে যেতে লাগলো তখন তার মুখ হতে আগুনের হল্কা বের হতে লাগলো। সেই আগুনে গাছপালা মানুষ পশু-পাখি পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগলো। ফেরাউন ছুটে গিয়ে মুসার হাত ধরে মিনতি করে বললেন ঃ মুসা, খোদা নাকি তোমাকে লোকের মঙ্গল করবার জন্য পাঠিয়েছেন আর তুমি তাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছো? একে নিবৃত্ত কর।

মুসা অজগরের গায়ে হাত দিতেই পুনরায় লাঠিতে পরিণত হলো। তিনি তখন ফেরাউনকে বললেন ঃ আশা করি আপনি এখন অহঙ্কার ত্যাগ করে ধর্মপথে আসবেন।

ফেরাউন বিবেচনা করে পরের দিন জবাব দেবেন বলে সেদিন মুসাকে যেতে বললেন।

মুসা চলে গেলেন।

ফেরাউন রঙমহলে ফিরে এসে কেমন করে মুসাকে জব্দ করা যায় সে বিষয়ে উজীর-নাজীরদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। উজীর হামান অতিশয় কুচক্রী এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি ফেরাউনকে বুঝিয়ে দিলেন, মুসা একজন প্রথম শ্রেণীর যাদুকর এবং অতিশয় ধাপ্পাবাজ ব্যক্তি। তাকে জব্দ করার একমাত্র কৌশল রাজ্যের যত বড় বড় যাদুকর আছে সকলকে তলব করে আনতে হবে। তাদের বিদ্যাবুদ্ধির কাছে হার মেনে মুসা এখান থেকে পালিয়ে গেলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

সুতরাং হামানের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হলো। রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত ছোট-বড় যাদুকর ছিলো তাদের আনবার জন্য লোক পাঠানো হলো। তারা যথাসময়ে রাজধানীতে এসে হাজির হলো।

কার কত ক্ষমতা তা দেখবার দিন স্থির হলো। ফেরাউনের আহ্বানে মুসাও এলেন। একজন যাদুকর মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো, অমনি চারিদিক থেকে হাজার হাজার সাপ, বিছা, ভীমরুল সৃষ্টি হয়ে নানা রকম শব্দ করতে করতে মুসার দিকে ছুটে যেতে লাগলো। অপর একজন মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলো, অমনি শত শত সিংহ, ব্যাঘ্র চারিদিক থেকে ভীষণ গর্জন করে মুসার দিকে এগিয়ে গেলো।

মুসা বিস্‌মিল্লাহ বলে তার লাঠি মাটিতে রেখে দিতেই অমনি এক ভয়ানক অজগর ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠলো। চক্ষের পলকে সে যাদুকরদের সেই সিংহ, বাঘ, সাপ, বিছা, টপাটপ গিলে ফেললো। তারপর ধরলো যাদুকরদের। তাদেরও গলাধকরণ করে ফেরাউনের দিকে এগিয়ে গেলো। ফেরাউন সেখান থেকে ছুটে রঙমহলে পালিয়ে প্রাসাদের সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এই ঘটনার পর কিছুদিন কেটে গেলো। হঠাৎ একদিন মুসা ফেরাউনের দরবারে এসে পুনরায় তাকে ধর্মকথা শোনাতে লাগলেন এবং ধর্মপথে চলবার জন্য উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।'

আল্লাহ্‌তা'লা একদা স্বপ্নে মুসাকে বনি-ইসরাইলদিগকে পাপের ভূমি, অধর্মের রাজত্ব মিশর থেকে তাদের পিতৃভূমি কেনান্ দেশে ফিরে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। সেই হুকুম অনুসারে মুসা ফেরাউনের কাছে ইসরাইলদের কেনান্ দেশে যাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ফেরাউন কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাদের মিশর ত্যাগ করতে দিলেন না, বরং তাদের প্রতি অত্যাচার করতে লাগলেন।

ইসরাইলদিগকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করবার কোন উপায় না পেয়ে মুসা খোদার নিকটে প্রার্থনা করতে লাগলেন। খোদা তখন তাকে মিশরীয়দের উপর অত্যাচার করবার হুকুম দিলেন। মুসা ও তার ভ্রাতা হারুন মিশরীয়দের উপর নতুন নতুন উৎপাত আরম্ভ করলেন। মুসা নদীতে লাঠির আঘাত করলেন। দেখতে দেখতে পানি রক্ত হয়ে গেলো। নদীর সমস্ত মাছ মরে গেল, তারপর পচে দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো। এতটুকু পানি পান করবার কিছুমাত্র উপায় রইলো না। ইসরাইলদের মিশর ত্যাগের অনুমতি প্রদানের জন্য মুসা পুনরায় ফেরাউনকে অনুরোধ করলেন। ফেরাউন বললেন ঃ নদীর পানি শুধরে দাও, আমি সে বিষয়ে বিবেচনা করবো।

মুসা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। কিন্তু মুসাকে কয়েকদিন ঘুরিয়ে ফেরাউন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। মুসা ক্রুদ্ধ হয়ে পানির দিকে লাঠি ছুঁড়ে দিলেন। অমনি দলে দলে ব্যাঙ মিশর ভূমি ছেয়ে ফেললো। ফেরাউন মুসাকে ব্যাঙের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন, মুসা এবারও রক্ষা করলেন।

ব্যাঙের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ফেরাউন প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলেন। মুসাও পুনরায় তাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করলেন। উঁকুনের উৎপাত শুরু হলো; তারপর মাছির উৎপাত, পশুর মড়ক—একের পর এক আসতে লাগলো। এমন কি সকলের ভীষণ ফোঁড়া হলো, দেশে শিলাবৃষ্টি হয়ে গেলো, পঙ্গপাল এসে সব ফসল নষ্ট করে দিলো।

তারপর একবার তিনদিন-চারদিন এমন অন্ধকার হয়ে থাকলো যে, কোনদিকে কারো নজর করবার উপায় রইলো না।

মুসা আবার ফেরাউনকে অনুরোধ করলেন যে, এখনও ইসরাইলদিগকে মিশর ছেড়ে যেতে অনুমতি দেওয়া হোক। যদি তাদের ছেড়ে যেতে দেওয়া না হয় তাহলে মিশরীয়দের ওপর যে ভীষণ অত্যাচার হবে তার তুলনায় বর্তমানের অত্যাচার অতি নগণ্য। ফেরাউনকে বার বার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর কথায় ফেরাউন একেবারে কর্ণপাত করলেন না।

ইসরাইলদিগকে উদ্ধার করবার জন্য খোদা অসন্তুষ্ট হয়ে মিশরীয়দের প্রত্যেক বাড়ির বড় ছেলে ও বড় পশুকে মেরে ফেললেন। এবার ফেরাউনের বড় ভয় হলো। তিনি ইস্‌রাইলদের চলে যাবার হুকুম দিলেন।

ইসরাইলরা অনুমতি পেয়ে দল বেঁধে রওনা হলেন, মুসা ও হারুন আগে চললেন। ইসরাইলদের চলে যেতে দেখে হামান প্রভৃতি উজীরগণ ফেরাউনকে কুপরামর্শ দিতে লাগলো, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, নালা-নর্দমা প্রভৃতি সাফ করা, রাজ্যের অনেক ছোটবড় কাজ যা তাদের দিয়ে জোর-জবরদস্তি করে করিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো, তারা যদি চলে যায় তাহলে এসব কাজ কারা করবে? সুতরাং তারা যাতে মিশর ছেড়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করবার জন্য ফেরাউনকে অনুরোধ করতে লাগলো। ফেরাউন চিন্তা করে দেখলেন ইসরাইলরা চলে গেলে সত্যই কাজকর্মের যথেষ্ট অসুবিধা হবে। তখন তিনি নিজে ও মিশরীয়রা তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন।

ইসরাইলরা ততক্ষণে লোহিত সাগরের তীরে এসে পৌছে গেছেন। এমন সময় তাঁরা পেছনে চেয়ে দেখতে পেলেন, ফেরাউনের অগণিত সৈন্য তাঁদের ধরতে আসছে। পেছনে এই বিপদ–সম্মুখে প্রকান্ড সাগর। ইসরাইলগণ কোথায় যাবেন ঠিক করতে পারছেন না, ভয়ে তাঁরা কাঁপতে লাগলেন। এমন সময় আল্লাহতা'লা মুসাকে দৈববাণীতে আদেশ করলেন ঃ মুসা, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রের ওপর আঘাত করো।

মুসা তাই করলেন ঃ বিশাল সাগর দুই ভাগ হয়ে দেয়ালের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সেই পথ দিয়ে হারুন আগে চললেন, ইসরাইলরা নিরাপদে পিছু পিছু ওপারে চলে গেলেন। সমস্ত লোক পার হয়ে গেলো মুসা নিজেও।

তখনও সাগরের সেই রাস্তা তেমনি রয়ে গেলো। ফেরাউন তাঁহার লোকজন এবং সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওপারে এসে থামলেন। তিনি দেখলেন, সাগরের মধ্যে এক আশ্চর্য রাস্তা। আরও দেখলেন, সেই রাস্তা ধরে মুসা ও তাঁর লোকজনেরা নিরাপদে পার হয়ে গেলেন। ফেরাউন সেই পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, তাঁর পেছনে অগণিত সৈন্য ছুটে চললো। যখন তারা সাগরের মাঝামাঝি এসেছে এমন সময় খোদা দৈববাণীতে মুসাকে বললেন ঃ তাড়াতাড়ি সাগরের ওপরে তোমার লাঠি দিয়ে আবার আঘাত করো।

খোদার হুকুম মতো যেই তিনি সাগরের পানিতে আঘাত করলেন, অমনি দুই দিক থেকে পানি খাড়া উঁচু দেয়াল ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ওপর পড়ে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। মরবার সময় তারা কাঁদবার অবসরটুকু পর্যন্ত পেলো না।